কুরআনের আদর্শ বাস্তবায়নেই আছে সব সমস্যার সমাধান

----লেখক: হারুন ইয়াহিয়া

অনুবাদ: জাবীন হামিদ
ই-মেল : jabin.hamid@gmail.com

লেখক পরিচিতি:

ইয়াহুদী , খৃস্টান ও মুসলমানদের শ্রদ্ধেয় দুই নবী হযরত হারুন (আ:) ও হযরত ইয়াহিয়া (আ:) -- যারা ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন , তাঁদের পুণ্য স্মৃতির সম্মানে তুরস্কের লেখক আদনান ওকতার নিজের ছদ্মনাম " হারুন ইয়াহিয়া " বেছে নিয়েছেন।

তাঁর বইয়ের প্রচ্ছদে হযরত মুহাম্মাদ (দ:) এর ব্যবহৃত সিলমোহর প্রতীকী অর্থ বহন করে। পবিত্র কুরআন যে শেষ আসমানী কিতাব ও হযরত মুহাম্মাদ (দ:) যে সব নবী ও রাসূলদের সিল বা শেষ রাসূল , তা এই সিলমোহরের মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে।

লেখক ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে যেন জিহাদে লিপ্ত। কুরআন ও হযরত মুহাম্মাদ (দ:) এর জীবন আদর্শের কথা তিনি তাঁর বইগুলিতে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি পার্থিব স্বার্থে ভোগবাদী মানুষের ধর্মহীনতা , বিবর্তনবাদীদের মিথ্যা প্রচার ও ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞতার অশুভ পরিণাম নিয়ে মুসলমানদের সতর্ক করেছেন।

বিবর্তনবাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা :

বিভিন্ন জাতিগত বিদ্বেষ ও ভুল বোঝাবোঝির মূলে রয়েছে মিথ্যা এক তথাকথিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। এই সুস্পষ্ট বর্বরতা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। কেননা , বর্তমান যুগের বিভিন্ন ভুল মতবাদ এই মিথ্যার প্রতিষ্ঠিত । এসবের মিথ্যা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হলো ডারউইনের তথাকথিত বিবর্তন মতবাদ। অনেকেই ভাবেন এটি কেবল জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু আসলে বিবর্তনবাদ এর চেয়েও অনেক বেশী কিছু। এটি শুধুমাত্র জীববিজ্ঞানের মতবাদ নয় , এটি অনেক দর্শনতত্ত্বের ভিত যা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে প্রভাবিত করেছে ও করছে।

হারুন ইয়াহিয়ার বই এই মিথ্যা তত্ত্বগুলির অসারতা পাঠকদের সামনে তুলে ধরে ও মহান স্রষ্টার সর্বশেষ কিতাব কুরআন শরীফের আদর্শ জীবনে বাস্তবায়ন করতে তাগিদ দেয়। মুসলমান ও অমুসলমান সবারই এই বইয়ের থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।

অনুবাদের ব্যপারে কোন পরামর্শ থাকলে ই-মেলে জানাতে অনুরোধ করছি। যাজাক আল্লাহু খায়রান (আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিফল দান করুন)।

জাবীন হামিদ
ই-মেল : jabin.hamid@gmail.com

সূচী:

ভূমিকা

নাস্তিকদের জীবন বড়ই উদ্দেশ্যহীন

আল্লাহ'র ভয় মানুষের মধ্যে না থাকলে কী হবে ?

কুরআনের আদর্শে জীবন গড়লে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়:

রাজনীতির চিত্র

অর্থনীতিতে ধর্মহীনতার প্রভাব:

ধর্মীয় মূল্যবোধ আদেশ করে অভাবী ও ইয়াতীমকে রক্ষা করতে:-

ধর্মহীন সমাজে নৈতিকতার অবক্ষয়:

ধর্মহীনতার কারণে হত্যা:

যুদ্ধ কেন হয় ?

ধর্মীয় উন্মত্ততা ও জাতিগত বিদ্বেষ:

ধর্মহীন সমাজে নিষ্ঠুরতা ও বিশৃঙ্খলা:

উপসংহার:

%%%%

ভূমিকা:

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

" আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা যুদ্ধ করছ না আল্লাহ'র পথে এবং সেসব অসহায়-দুর্বল নর-নারী ও শিশুদের জন্য যারা বলে : হে আমাদের প্রতিপালক ! এ জনপদ থেকে আমাদের বের করে নিন , এখানকার অধিবাসীরা ভয়ানক অত্যাচারী ? আর আপনার তরফ থেকে কাউকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী করে দিন " (পবিত্র কুরআন; সুরা নিসা ; ৪: ৭৫)।

এই পৃথিবীতে বেশীরভাগ মানুষই নির্যাতিত। এরা অত্যাচারিত , নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার এবং সীমাহীন অভাবের মধ্যে গৃহহীন অবস্থায় নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। অসুখে তাঁরা চিকিৎসা পায় না । অনেকে এত গরীব যে এক টুকরো রুটি কেনারও পয়সা নেই তাঁদের।

অনেক বৃদ্ধ আছেন যারা অনাদরে, পরিত্যক্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন এবং চিকিৎসার কোন সুযোগই নেই তাঁদের। অনেকে আছে বৈষম্যের শিকার। নিজেদের ঘর-বাড়ি ও দেশের মাটি থেকে তাঁরা বহিস্কৃত শুধুমাত্র জাতিগত , ভাষাগত পার্থক্য বা বর্ণ-বৈষম্যের কারণে। কখনো তাঁদের উপর গণহত্যা চালানো হয় । সহায়-সম্বলহীন অপুষ্টির শিকার , অসহায় শিশুরা টাকা রোজগারের জন্য শ্রম দিতে বা ভিক্ষা করতে বাধ্য হয়।

অসংখ্য মানুষ বেঁচে থাকার অনিশ্চয়তা নিয়ে ভয়-ভীতির মধ্যে জীবন কাটায়। এই পৃথিবীতে রয়েছে অপরিসীম ভোগ , সুযোগ-সুবিধা এবং সম্পদের প্রাচুর্য। যারা এই ধরনের সুখী জীবন যাপনের সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান , তারা গৃহহীনদের পাশ কাটিয়ে চলে যায়। গরীবদের ছবি এবং এইসব হতভাগ্যদের দুর্দশা তারা টিভিতে দেখে। মাঝে মাঝে

তারা কিছু সময়ের জন্য এদের প্রতি করুণা অনুভব করে কিন্তু এরপরই তারা টিভির চ্যানেল বদলে ফেলে এবং বিবেকের তাড়া থেকে খুব তাড়াতাড়িই সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যায়।

এই সমাজে যারা নানা সুবিধা , আরাম -আয়েশ ভোগ করছে এবং নানাভাবে সৌভাগ্যবান , তারা কখনো চিন্তা করে না কিভাবে অসহায় , কম-সৌভাগ্যবান মানুষদের দুর্দশা থেকে মুক্তি দেয়া যেতে পারে ? তাঁরা বিশ্বাস করে এটা তাঁদের দায়িত্ব নয় ---যদিও তারা অনেক ধনী , অনেক ক্ষমতাবান এবং যথেষ্ট সুবিধজনক অবস্থানে রয়েছে এইসব হতভাগ্যদের সাহায্য করার জন্য।

অবশ্য স্বাচ্ছন্দ্য ও ক্ষমতাই এসব হতভাগ্যদের রক্ষার জন্য এবং এই পৃথিবীকে সুন্দর , বাসযোগ্য করে তোলার জন্য যথেষ্ট নয় ---যাতে রয়েছে শান্তি , ন্যায়-বিচার , আত্মবিশ্বাস এবং কল্যাণ ।

এই পৃথিবীতে যদিও অনেক উন্নত দেশ রয়েছে , তবুও অনেক দরিদ্র দেশও রয়েছে যেমন ইথিওপিয়া যেখানে ক্ষুধায় রোজই মানুষ মারা যায়। এতে এটাই মনে হয় যে , কিছু জাতির সম্পদ ও ক্ষমতা পৃথিবীর সব মানুষদের ক্ষরা, অভাব এবং গৃহযুদ্ধ থেকে রক্ষা করতে যথেষ্ট নয়। বিবেকসম্পন্ন ধর্মভীরুর পক্ষেই সম্ভব সম্পদের প্রবাহ অভাবী ও হতভাগ্যদের দিকে প্রবাহিত করা। বিবেকসম্পন্ন হওয়ার একটাই উপায় ---ধর্মে বিশ্বাস । একমাত্র ধর্মবিশ্বাসীরাই বিবেকসম্পন্নভাবে জীবন কাটায়।

চূড়ান্তভাবে সব অবিচার , অত্যাচার , সন্ত্রাস , গণহত্যা , ক্ষুধা , অভাব এবং নির্যাতনের সমাধান একটাই ---পবিত্র কুরআনের মূল্যবোধের বাস্তবায়ন।

প্রথমত: এই ধরনের প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি হয় ঘৃণা , বিদ্বেষ , স্বার্থপরতা , নির্বিকার মনোভাব ও নিষ্ঠুরতা থেকে। তাই এসব দুর করতে প্রয়োজন ভালবাসা , সহানুভূতি , ক্ষমা , ভদ্রতা , স্বার্থহীনতা , সংবেদনশীলতা , সহনশীলতা , বিচার-বিবেচনা এবং জ্ঞান । এসব সহানুভূতিসম্পন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি কেবলমাত্র তাঁদের মধ্যেই পাওয়া যায় , যারা জীবন কাটান পবিত্র কুরআনের আলোকে ---যার নির্দেশ সরাসরি এসেছে আমাদের স্রষ্টার কাছ থেকে --" .....তোমাদের কাছে এসেছে আল্লাহ'র তরফ থেকে এক জ্যোতি ও একটি

স্পষ্ট কিতাব। যারা আল্লাহ'র সন্তুষ্টি কামনা করে , এ কিতাব দিয়ে তিনি তাঁদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং তাঁদের তিনি নিজ ইচ্ছায় বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে , আর তিনি তাঁদের পরিচালিত করেন সরল-সঠিক পথে " (সুরা মায়িদা ; ৫: ১৫-১৬) ।

অন্য আরেকটি আয়াতে আল্লাহ আমাদের জানান যে , মানুষের ইচছা /অনিচছা অনুযায়ী সত্যকে নির্ধারিত করতে দিলে অবশ্যই দোষ-ত্রুটি , সন্দেহের সৃষ্টি হবে --" আর সত্য যদি তাদের কামনা- বাসনার অনুসারী হত, তবে অবশ্যই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত আসমান , জমিন ও এদের মধ্যবর্তী সব কিছুই। আমি তাদেরকে দান করেছি উপদেশ , কিন্তু তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় " (সুরা মুমিনুন ; ২৩: ৭১) ।

আপনি যখন এই লেখাটি পড়ছেন , তখন পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ শীতে ও ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে অথবা জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হচ্ছে । এ কারণে , বিবেকসম্পন্ন মানুষদের এ সব বিষয়ে চিন্তা করা দরকার এবং সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করা উচিৎ । তাঁদের এমনটিই মনে করা উচিৎ যেন এই কষ্টগুলি তাঁরা নিজেরাই অথবা তাঁদের একান্ত প্রিয়জনেরা পাচ্ছে। এসব কষ্ট ও অত্যাচার দুর করতে আমাদেরকে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উপায় ---এই দুইভাবেই কাজ করতে হবে।

আল্লাহ বিবেকবান ও বিশ্বাসী মানুষদের উপর এই দায়িত্ব দিয়ে বলেছেন , " আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা যুদ্ধ করছ না আল্লাহ'র পথে এবং সেসব অসহায়-দুর্বল নর-নারী ও শিশুদের জন্য যারা বলে : হে আমাদের প্রতিপালক ! এ জনপদ থেকে আমাদের বের করে নিন , এখানকার অধিবাসীরা ভয়ানক অত্যাচারী ? আর আপনার তরফ থেকে কাউকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী করে দিন (সুরা নিসা ; ৪: ৭৫)।

কুরআনের আদেশের কথা বিবেচনায় আনলে আমরা নিজেদের দায়িত্ব বুঝতে পারি। মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যপার হলো , প্রথমে বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ে উদ্যোগ নিতে হবে যাতে নাস্তিকতার বিরুদ্ধে কুরআন ও হাদীসের মুল্যবোধ জয়ী হয়। দুর্বল , অসহায় , গৃহহীন এবং বিপন্ন মানুষদের রক্ষার একমাত্র উপায় হলো কুরআনের আদর্শ অনুসরণ করা --- যে নীতি সব মানুষের জন্য প্রযোজ্য । সেজন্য কুরআনের বাণী প্রচার করা ও মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেয়া মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের সামিল।

যারা নিজেদের বিবেকের কথা শোনে না , যারা অন্যের দু:খে নির্বিকার , যারা অর্থ-সম্পদ তুচ্ছ কাজে অর্থহীনভাবে খরচ করে ; যারা এতীমদের জন্য সহানুভূতি দেখায় না ; যারা নির্যাতিত নারী , শিশু , বৃদ্ধদের প্রতি উদাসীন ; যারা শুধু অনৈতিক ও অসুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট ও তাতেই খুশী ---- তাদেরকে অবশ্যই পরকালে এসবের জন্য দায়ী হতে হবে ।

সুরা মাউন

১। " তুমি কি দেখেছ তাকে , যে ধর্মকে অস্বীকার করে ?

২। সে তো ঐ ব্যক্তি , যে ইয়াতীমকে রুঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়,

৩। এবং মিসকীনকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করে না।

৪। অতএব , দারুণ দুর্ভোগ ঐ সব সালাত আদায়কারীদের ,

৫। যারা নিজেদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন।

৬। যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে ,

৭। এবং গৃহস্থালীর দরকারী ছোট-খাট সাহায্য দানে বিরত থাকে (১০৭ : ১-৭)।

নাস্তিকদের জীবন বড়ই উদ্দেশ্যহীন:

আমাদের এই সময়ে মানুষের জীবন বড়ই উদ্দেশ্যহীন। সবাই গতানুগতিক একটি জীবনধারাকে আদর্শ হিসাবে বেছে নিয়েছে । ভাল খাবে , ভাল চাকরী করবে , সুন্দর বাসায় থাকবে , বিয়ে করবে ইত্যাদি। এ ধরনের জীবন আদর্শের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো আরো ভালভাবে বেঁচে থাকা ও সন্তানদের বড় করে তোলা। আমাদের সমাজের এই ধরনের লক্ষ্য ও আদর্শহীন জীবনকে আরো ভালভাবে বুঝতে হলে চারপাশে তাকান। বেশীরভাগ মানুষই বড়ই সীমিত দৃষ্টিভঙ্গীর ।

এমনো হয় , প্রিয় টিভি সিরিয়াল নিয়মিত দেখতে পারা বা জনপ্রিয় কোন সিনেমা উপভোগ করতে পারলেই অনেকের কাছে জীবনকে অর্থবহ মনে হয়। এ সব মানুষের কাছে জীবনের লক্ষ্য বলে যদি কিছু থাকে তা হলো কোন নামকরা ক্লাবের সদস্য হওয়া ও সমাজের গৎ বাঁধা স্রোতে ভেসে চলা।

অন্য এক দল রয়েছে যাদের মন-প্রাণ পড়ে রয়েছে ব্যবসা বা অর্থ রোজগারে। সারাটা জীবন ধরে তারা শুধু বাসা আর অফিস , অফিস আর বাসা ---এভাবেই দিনের পর দিন পার করে দিচেছ। একজন তাঁর যুবক বয়সে চাকরীতে ঢুকে হয়তো একই অফিসে পরের দীর্ঘ ৪০ বছর পার করে দিল। মাঝেমধ্যে সে শুক্রবার আসার অপেক্ষা করে। তবে তাঁর প্রধান লক্ষ্যগুলি হলো কোন ঝামেলা ছাড়াই নানা ধরনের করের হিসাব থেকে মুক্তি পাওয়া , সব রকমের ভাড়া দিতে সক্ষম হওয়া এবং সন্তানের ভবিষ্যত সুরক্ষিত করা। দেশের বা পৃথিবীর কোন খবর খুব কমই তাকে উত্তেজিত করে। শুধুমাত্র যে ঘটনা তার ব্যবসার উপর প্রভাব ফেলে ,সেটাই তার কাছে কোন অর্থ বহন করে। এছাড়া , অন্য কোন ঘটনা বা বিষয় নিয়ে সে চিন্তা করে না।

সে একই বৃত্তে আবদ্ধ জীবনকেই গ্রহণ করেছে। শুধুমাত্র তার বাণিজ্যের স্বার্থে আঘাত হানতে পারে ---- এমন বিষয় নিয়েই সে চিন্তিত। তার উদ্বেগ প্রকাশের জন্য সে টিভির কোন আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশ নেয় অথবা রাতভর ব্যবসার সমস্যা নিয়ে কোথাও আলোচনা করে কোন সমাধান ছাড়াই। পরের দিন , নতুন দিনটি সে শুরু করে ঠিক সেভাবেই যেভাবে আগের দিনটি করেছিল।

কম বয়সী ছেলেমেয়েরাও এই একই ধরনের উদ্দেশ্যহীনতায় ভুগছে ; জীবনকে অর্থবহ করতে যা যা প্রয়োজন , সে সবের তাদের প্রচন্ড অভাব। এসব ছেলেমেয়েদের একটা বড় অংশ জানেই না তাদের জাতীয় নেতারা কারা। তারা কী ধরনের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে , তাদের সিদ্ধান্তের কী প্রভাব দেশের নিরাপত্তা , অর্থনীতি , শিক্ষা ও বিচার-ব্যবস্থার উপর পড়বে। বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রধান প্রধান ঘটনা ও উন্নয়নের খবরে মনোযোগ না দিয়ে তারা ব্যস্ত থাকে তুচছ , মূল্যহীন হৈ-হুল্লোড়ে। এর ফলে বিশ্বের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির গুরুত্ব বুঝতে পারার যোগ্যতা তারা অর্জন করতে পারে না।

তাদের কথাবার্তা প্রায়ই সীমিত থাকে কম্পিউটার গেমস , ইন্টারনেটে আড্ডা , ডেটিং , স্কুলের ছোট-খাট কোন বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে অহেতুক ঠাট্টা-তামাশা , পরীক্ষায় নকল করা , সামনে ছুটির দিনে কী মজা করা যেতে পারে তার পরিকল্পনা করা , নতুন ফ্যাশন বা ফুটবল খেলা নিয়ে আলোচনা ইত্যাদিতে।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা , ম্যাগাজিনের বিভিন্ন জরিপের বিষয় থাকে কিশোর-তরুণদের কাছে ভোট চাওয়া যে , জীবনের দেখা সেরা গোল কোনটি ? কে তার প্রিয় তারকা বা জনপ্রিয় মডেলের মত দেখতে ? কে জনপ্রিয় ব্যান্ড তারকার মত গাইতে বা গিটার বাজাতে পারে ইত্যাদি। তথাকথিত আধুনিকতার স্রোতে তারা ভেসে চলে। নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটানোর চিন্তা তারা করে না। একটি উদাহরণ : সুন্দর

করে কথা বলার কৌশল শেখার চিন্তাও তরুণরা করে না বা এর গুরুত্বও তারা বোঝে না । কারণ তারা জানেই না মানুষের সাথে কী নিয়ে বা কিভাবে কথা বলতে হবে বা অন্যকে প্রভাবিত করার গুরুত্ব কতটুকু ।

এছাড়া , আজ তরুণ প্রজন্ম বই পড়তে চায় না। যে মানুষের জীবনে একটি উদ্দেশ্যে আছে সে জ্ঞানের আলোয় নিজেকে সমৃদ্ধ করে ; অন্যের দৃষ্টিভঙ্গীও জানার চেষ্টা করে। যাতে করে বিভিন্ন মতবাদের অস্তিত্ব ও মতবাদগুলির ভাল-মন্দ দিক সম্পর্ক তাঁর পরিষ্কার ধারণা থাকে। ভাল-মন্দ সম্পর্কে তাঁর মতামত পরিষ্কার । যে ব্যক্তি জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তেমন সচেতন নয় , এসব মতবাদগুলির অস্তিত্ব তার কাছে কোন অর্থ বহন করে না। সবচেয়ে বড় কথা , সে জানেই না যে এসব মতবাদের কোন অস্তিত্ব আছে এবং অন্য মানুষরা এসব নিয়ে কী চিন্তা-ভাবনা করছে।

আজকাল অনেক সমাজেই মানুষের মধ্যে বই ও পত্রিকা পড়ার ব্যপারে তীব্র অনীহা রয়েছে ; যদিও ট্যাবলয়েড পত্রিকা বা কাগজের বিনোদনমুলক কলাম যেখানে সাধারণত গুজব ও রগরগে খবরই বেশী ছাপা হয় এবং টিভির হালকা আনন্দের ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানগুলির প্রতি পাঠক ও দর্শকদের মধ্যে প্রচন্ড চাহিদা রয়েছে।

অধিকাংশ মানুষেরই হাতে যদিও প্রচুর সময় রয়েছে -- টিভির সামনে বসে নাটক , সিনেমা দেখেই সেই সময়টা তারা খুশীমনে কাটিয়ে দেয় ---যদিও তাদের মনের ইতিবাচক বিকাশ ঘটাতে এটা কোন সাহায্য করে না। এটাই প্রমাণ যে , মানুষ কোন আদর্শ থেকে নিজেকে কিভাবে বঞ্চিত করছে এবং অধ:পতিত হচ্ছে।

জীবনে কোন উদ্দেশ্য না থাকা এবং বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন থাকা মানবতার প্রতি হুমকিস্বরুপ। জীবনের প্রতি সুনির্দিষ্ট গভীর কোন লক্ষ্য আছে , এমন মানুষের চেয়ে লক্ষ্যহীন , আদর্শহীন , অর্থহীন জীবনের প্রতি অধিকাংশ মানুষের ঝোঁক বা কোন গভীর মূল্যবোধ না থাকাটা মানবতার প্রতি সত্যিকারের হুমকি। কেননা , যে সব নেতৃবৃন্দ বিপদ্জনক ও ক্ষতিকর মত ও আদর্শের বাস্তবায়ন করতে চায় , বাস্তবতা সম্পর্কে যারা সচেতন নয় , সেই ধরনের জনগণ কোন প্রশ্ন ছাড়াই বা কোন খোঁজ-খবর না নিয়েই সেই সব ক্ষতিকর নীতি মেনে নেয়। এ ধরনের অসচেতন মানুষদের বশীভুত রাখা , ইচ্ছামত পরিচালিত করা নেতৃত্বের জন্য অত্যন্ত সহজ কাজ।

অরাজকতার সমর্থক , দলীয় সন্ত্রাসীদের দিয়ে মানুষের মধ্যে ও নিজ দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে ঘৃণা ও শত্রুতার জন্ম দেয়ার সময় এই নেতারা কোন প্রতিরোধের মুখোমুখি হয় না। একটি উদাহরণ দেয়া যাক্: একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যান্টিনে বসে প্রচার চালিয়ে নৈরাজ্যবাদীরা ধীরে ধীরে তাদের নাশকতামুলক মতবাদগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের মনে

ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করে। যারা এর কুফল সম্পর্কে সচেতন নয় , তারা নির্বিকারভাবে তাকিয়ে দেখবে যে তার ঠিক পাশের ছাত্রটিই এই সব বিশেষ মতবাদে দীক্ষা পাচ্ছে।

সে কিন্তু বুঝতেই পারছে না যে , তার এই পাশের জনই ধীরে ধীরে নৈরাজ্যবাদী ও সন্ত্রাসীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দয়া-মায়াহীন এক অপরাধীতে পরিণত হচ্ছে। কিছুদিন পর সহজ-সরল , বিভ্রান্ত এই তরুণরাই অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে নিজেদের পুলিশ , প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং নিরীহ জনগণের বিরুদ্ধে সেই অস্ত্র ব্যবহার করবে। আবার কখনো যদিও বা সে এই সব বিপদ সম্পর্কে আঁচ করতে পারে , তবুও সে সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে নির্বিকার থাকে । কেননা , নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সে মোটেও সচেতন নয়। তাছাড়া , এ ধরনের সমস্যাকে দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করার যোগ্যতা ও মন-মানসিকতাও তার নেই।

আল্লাহ বিভ্রান্ত , আদর্শহীন মানুষ সম্পর্কে কুরআনে বলেছেন , " তুমি তাদের ছেড়ে দাও, তারা খেয়ে নিক্, ভোগ করে নিক্ এবং অলীক আশা তাদেরকে ভুলিয়ে রাখুক , খুব তাড়াতাড়ি তারা (প্রকৃত অবস্থা) জানতে পারবে " (সুরা হিজর ; ১৫ : ৩) । একজন সচেতন মানুষ লক্ষ্য করেন যে , বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নতুন নীতির বিরুদ্ধে কোন একটি দল যেভাবে প্রতিবাদ করছে , তাতে ভাল 'র চেয়ে মন্দই হচ্ছে বেশী; এটা হচ্ছে ঐ বিশেষ দলটির দৃষ্টিভঙ্গীর পরিণাম ---এরা ভাল কাজের সমর্থনে এগিয়ে আসে না। অন্য একটি দল এসব নীতির ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকতে পছন্দ করে। এরা মানুষকে ভাল কাজের সমর্থনে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত না করে বরং বিষয়টি সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলে এবং মানুষকে এটাই বলে যে নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে বিরোধীদের থেকে দুরে থাকতে।

অন্য কোন দল আবির্ভূত হয় ঘৃণা ও শত্রুতার প্রকাশ ঘটিয়ে । শ্লোগান দিয়ে , মিছিল করে , লাঠি ও পাথর হাতে নিয়ে বিক্ষোভ করে তারা অন্য এক ধরনের ভয়-ভীতি ও আতংকের জন্ম দেয়। তাদের এসব প্রচেষ্টার কোন মুল্য নেই । তারা আল্লাহ'র নির্দেশ প্রচারে উৎসাহী নয় ও এমন সব কাজ করে যার সাথে কুরআনের আদর্শের কোন মিল নেই । আল্লাহ কুরআনে বলেছেন , দুনিয়ায় অবিশ্বাসীদের এসব কাজের কোন মুল্য নেই --- " যারা তাদের রবকে অমান্য করে তাদের উপমা : তাদের কাজ ছাই - ভস্মের মত যার উপর দিয়ে ঝড়ের দিনে প্রবল বাতাস বয়ে যায়। যা তারা উপার্জন করেছিল তার কিছুই তারা কাজে লাগাতে পারবে না। এটাই হল ঘোরতর বিভ্রান্তি " (সুরা ইবরাহীম; ১৪: ১৮)

এই ধরনের পরিস্থিতি এড়িয়ে যাওয়ার উপায় অবশ্যই মানুষের আছে। এটা নিশ্চিত করতে হবে যে , তারা নিজেকে এমন মানুষে পরিণত করবে না যারা শুধু নিজেদেরকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। মানুষকে উৎসাহ দিতে হবে এমন মানুষে পরিণত হতে যে বা যারা অন্যের উপকারে আসে ; যারা শুধু নিজের স্বার্থ বা নিজের দেশের সমস্যা নিয়েই ভাবে না ; বরং পুরো বিশ্বের সমস্যা নিয়ে তারা চিন্তা করে।

আল্লাহ পুরো মানবজাতির জন্য যে ধর্মকে নির্বাচিত করেছেন এবং পাক –কুরআনে যা প্রকাশ করেছেন তাতে এই চুড়ান্ত উদ্দেশ্যের প্রকাশ ঘটে--- " অতএব তুমি একাগ্র চিত্তে নিজেকে ধর্মে কায়েম রাখ; আল্লাহ'র প্রকৃতির অনুসরণ কর , যে প্রকৃতিতে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন ; আল্লাহ'র প্রকৃতির কোন পরিবর্তন নেই ; এটিই সরল ধর্ম ; কিন্তু বেশীরভাগ মানুষ তা জানে না " (সুরা রুম ; ৩০: ৩০)।

আল্লাহ যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন , তিনি ধর্মকেও সৃষ্টি করেছেন –এমন ধর্ম যা মানুষকে পরম শান্তি ও পূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়। সেজন্য সত্য ধর্ম ছাড়া অন্য কোন মত বা দর্শন মানুষ যা চায় সেই নিখুঁত শান্তি দিতে পারে না। এ কারণে , নানা ধরনের ভুল ও বিভ্রান্তিমুলক মতবাদের যারা সমর্থক ও প্রচারক , তাঁদেরকে অবশ্যই জানানো দরকার যে , কেন তারা ভুল ? এই সম্পর্কে তাদেরকে তথ্য ও প্রমাণ দিতে হবে এবং ভুল মতের বদলে সত্য ধর্মের সন্ধান জানাতে হবে । যারা লক্ষ্যহীন , আদর্শহীন মানুষ এবং যারা বিভ্রান্তিমুলক মতের অন্ধ সমর্থক ও অনুসারী , তাদেরকে পবিত্র কুরআন সম্পর্কে জানানোটা অপরিহার্য । কেননা , কুরআনের দিক-নির্দেশনা সম্পর্কে জানতে পারলে তখনই কেবল তারা বুঝবে যে এই পৃথিবী , এই জীবন ---এসব সৃষ্টি হয়েছে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে ।

কুরআনে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে বলেছেন, " আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবল এজন্য যে , যেন তারা আমারই ইবাদত করে " (সুরা যারিয়াত; ৫১ : ৫৬)।

আমরা সবাই একদিন মারা যাব । মারা যাওয়ার পরেই আমাদের সত্যিকারের জীবন যা অনন্তকাল স্থায়ী , তা শুরু হয়। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের লক্ষ্য হবে এমন মানুষ হওয়ার জন্য সংগ্রাম করা যেমন মানুষ আল্লাহ'র পছন্দের এবং যাকে আল্লাহ তাঁর মেহমান হিসাবে বেহেশতের বাগানে ঢুকতে অনুমতি দেবেন।

আমাদের কাজ ও বিশ্বাস ঠিক করে দিবে আমরা কি চিরকাল আগুনের মধ্যে থাকবো না চির-সুন্দর বাগানে থাকবো। এ কারণে , যে সব মানুষ উদ্দেশ্যহীনভাবে সময় নষ্ট করে এবং পরকালের জীবনে কোন উপকারে আসবে না এমন মূল্যহীন পেশায় নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে ; যারা মনে করে এই পৃথিবীতে কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই তারা খামোকা বেঁচে আছে , এমন মানুষদেরকে জরুরীভাবে সতর্ক করে দিতে হবে ও তাদেরকে অসচেতনতা থেকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

বেহেশত লাভের জন্য আল্লাহ'র সন্তুষ্টি অর্জনই এ দুনিয়ায় আমাদের প্রধান লক্ষ্য । এটা জানার পর আমরা আমাদের চারপাশে যা ঘটছে , সে ব্যপারে আর নির্বিকার থাকতে পারি না। আমরা এখন জানি , যে কোন ঘটনাই আমাদেরকে আল্লাহ'র সন্তুষ্টি অর্জনের সুযোগ এনে দেয় যদি আমরা সঠিক আচরণ করি।

চারপাশে বা পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে কোন অন্যায় , অবিচার দেখলে ধর্ম বিশ্বাসীদের মনে তীব্র কষ্ট হয়। যেমন, যে শিশুর থাকার জায়গা নেই , রাস্তায় রাস্তায় শীতে -গরমে যে অনেক কষ্টে জীবন কাটায় , তার প্রতি আমরা একটা দায়িত্ব অনুভব করি। কেননা, আল্লাহ কুরআনে আদেশ করেছেন , " তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করবে না ; আর ভিক্ষুককে ধমক দেবে না "

(সুরা দোহা ; ৯৩ : ৯-১০)। আমরা দরিদ্র , ইয়াতীমদের সাথে ভাল ব্যবহার করবো। আমরা চেষ্টা করবো এমন একটা উপায় বের করতে যাতে এই অসহায়দেরকে দুর্বিসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়া যায়। অবশ্য আমরা জানি যে , এসব অসহায় শিশুদের রক্ষার জন্য কুরআনের আদর্শে বিশ্বাসী শুধুমাত্র অল্প কয়েকজন বিশ্বাসীদের চেষ্টাই যথেষ্ট নয় । তাই , আমাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (দ:) এর আদর্শ বিশ্বের সব মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

স্বার্থপরতার জন্ম আদর্শহীনতা থেকে :

লক্ষ্য ও মহৎ কোন আদর্শ না থাকলে মানুষ ও সমাজ হয়ে পড়ে একই ধরনের---স্বার্থপর ও নির্বিকার। সবাই তখন শুধু নিজ নিজ স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত থাকে ; আর চারপাশে কী ঘটছে , না ঘটছে , সে ব্যপারে তাদের কোন মাথা ব্যাথা থাকে না এবং সেজন্য তারা কোন প্রতিক্রিয়াও দেখায় না।

যে মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে কেবল নিজের খুশীতে বেঁচে থাকা , সে তার চারপাশের ঘটনাগুলির মধ্যে কেবলমাত্র নিজের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির দিকেই মনোযোগ দেয় , অন্য

ব্যপারে থাকে একেবারে নির্বিকার। যেমন, যে দেশের সাথে তার ব্যাবসায়িক লেন-দেন আছে , সেই দেশে যুদ্ধ লাগলে সে মহাচিন্তায় পড়বে নিজের ব্যাবসায়িক ক্ষতির কথা ভেবে । সে মোটেও ভাববে না সেই অসহায় মানুষদের কথা যারা যুদ্ধে নৃশংসভাবে গণহত্যার শিকার হচ্ছে ;সে সব অসহায় শিশুদের নিয়ে সে চিন্তা করবে না , যারা যুদ্ধের নির্মম বলি হলো এবং সামগ্রিকভাবে যুদ্ধের কারনে সে দেশের যে দুর্বিসহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে , সেটা নিয়েও তার কোন চিন্তা নেই । তার মনে এসব কষ্টের চিত্রের কোন প্রতিফলন ঘটে না।

টাকার পিছনে ছুটতে ছুটতে সে একবারো ভাবে না , কিভাবে এইসব অসহায় মানুষদের সাহায্য করা যায়। এটি অসংখ্য উদাহরণের মধ্যে মাত্র একটি যা বেশীরভাগ মানুষই খুব স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছে। রোজই টিভি আর পত্রিকা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের অসহায় মানুষদের দু:খ -দুর্দশার কাহিনী প্রচার ও প্রকাশ করে যারা অসহনীয় কষ্ট ও সন্ত্রাসের মুখোমুখি । এসব অত্যাচার , বিশৃঙ্খলার মূলে রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ'র আদর্শের সমর্থক না হওয়া এবং স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসহীনতা ।
এটা প্যালেস্টাইন হোক্ বা ইন্দোনেশিয়া , কসোভো , চেচনিয়া বা বিশ্বের যে কোন প্রান্তেই আমরা দেখি শিশু সন্তানের সামনে মা-বাবাকে নির্যাতন করা হচ্ছে অথবা সামান্য এক টুকরো জমি দখলের জন্য মানুষকে বিতাড়িত করা হচ্ছে। একইভাবে আমরা এটা দেখে অভ্যস্ত যে , ছোট ছোট বাচ্চারা নিজেদেরকে বাঁচাতে বেপরোয়াভাবে পাথর ছুড়ে মারছে।

এসব ভয়ংকর দৃশ্য দেখেও অবশ্য ঘুমাতে যেতে মানুষের কোন অসুবিধা হয় না ও রোজকার অভ্যস্ত জীবনে ফিরে যেতে তাদের কোন কষ্ট হয় না --কেননা -- তারা তো ব্যক্তিগতভাবে এসব ঘটনায় কোন ক্ষতির শিকার হচ্ছে না। যেহেতু , এসব মানুষ বড় ধরনের কোন চিন্তা-ভাবনায় অভ্যস্ত না এবং মহৎ কোন আদর্শ ও বিচার-বিবেচনা বোধ এদের মধ্যে নেই , তাই এসব নিষ্ঠুরতায় এরা বিচলিত হয় না।

নির্মমভাবে যারা অত্যাচারিত হচ্ছে , তাদের জায়গায় নিজেকে চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারি এসব ঘটনার প্রতি যারা নিস্পৃহ থাকে , সেসব মানুষ কতটা বিবেকহীন। এসব মানুষরা যদি এমন পরিবেশে থাকতো যেখানে নিরপরাধ মানুষকে মেরে ফেলা হয় , তাঁদের স্ত্রী , পুত্র , ভাই-বোন , মা-বাবা না খেয়ে থাকে এবং নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার ---যদি এমন হতো সে নিজে চরম দারিদ্রের মুখোমুখি ? -----যদি এমন হয় যে তার কাছে কোন টাকা-পয়সা নেই এবং অসুস্থ শিশু সন্তানের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা সে করতে পারছে না ? এমন যদি হয় সে নিজের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হলো কোন অপরাধ না করেই ?----------তখন যদি সে এমন কারো দেখা পায় যে এ ধরনের

কোন অত্যাচারের মুখোমুখি হয় নি এবং যে শুধু টাকা-পয়সার চিন্তায় বিভোর এবং যার ধারণা " আমি কেন এসব মানুষকে বাঁচাতে যাবো ? '' .....তখন কি তার মনে হবে না , এই লোকটি একদম বিবেকহীন , পাষাণ , অমানুষ ?

সহানুভুতিশীল ও বিবেকসম্পন্ন হওয়ার জন্য এটা জরুরী নয় যে একজনকে অত্যাচার বা দু:খ ভোগ করতেই হবে। মানুষের দু:খ দেখলে এবং কুরআনের আলোকে তাদের কষ্টের কথা চিন্তা করাই এজন্য যথেষ্ট। কিন্তু, বেশীরভাগ মানুষ কুরআন থেকে নিজেদের দুরে রাখে এবং সেজন্য বিবেকের তাড়নাও তাদের মধ্যে খুব একটা নেই।

আল্লাহ এ ধরনের স্বার্থপর , বিবেকহীন , নিষ্ঠুর স্বভাবের মানুষ যারা ধর্মে বিশ্বাসী নয় , তাদের কথা কুরআনে বলেছেন , " নিশ্চয়ই মানুষ সৃজিত হয়েছে দুর্বলমনা-অস্থির চিত্ত, যখন তাকে কোন অনিষ্ট স্পর্শ করে , তখন সে হা-হুতাশ করে , আর যখন কোন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে , তখন সে কার্পণ্য করে " (সুরা মা'আরিজ ; ৭০: ১৯-২১) । যে সব মানুষ আল্লাহকে ভয় করে , তারা অসহায় মানুষদের প্রতি দায়িত্ব অনুভব করে । আল্লাহ বলেন , এই পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষ আছে ; এক দল সঠিক আর অন্য দল ভুল পথে আছে।

কুরআনে আল্লাহ বলেন , " আর আমি তো তাকে দেখিয়ে দিয়েছি দু'টি পথ , তারপর সে দুর্গম পথ পার হয় নি ; তুমি কি জানো সে দুর্গম খাঁটি পথ কী? তা হল , কোন দাস মুক্ত করা , অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্য দান করা , ইয়াতীম আত্মীয়কে অথবা মিসকীনকে ; তারপর সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয় যারা ঈমান আনে , এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্য্য ধারণের এবং দয়া-মায়ার। এরাই ডান দিকের সৌভাগ্যশালী। আর যারা আমার আয়াতসমুহ প্রত্যাখান করে , তারাই বাম দিকের , হতভাগা। তারা হবে আগুনের মধ্যে বন্দী।" (সুরা বালাদ ; ৯০ : ১০-২০) ।

সঠিক পথের কথা পরিষ্কার বর্ণনা করা হয়েছে কুরআনে ; তাই যে সব বিবেকসম্পন্ন , সচেতন মানুষ আল্লাহ'র দয়া ও করুণার প্রত্যাশী এবং বেহেশতের বাগানে যারা যেতে চায় ; তারা অন্যায় -অত্যাচারের প্রতি নির্বিকার থাকবে বা অসহায় মানুষদের ভবিষ্যতের কথা ভাববে না ---এটা হতে পারে না। সব সচেতন মানুষকে মনে রাখতে হবে , আজ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যে অত্যাচার , অন্যায় , কু-শাসন চলছে তাতে কোটি কোটি মানুষ কষ্ট ও সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে ।

কেউ কেউ বলে , কিছু নির্দিষ্ট মানুষ এসব অত্যাচারের জন্য দায়ী ; আমি কেন এর দায় বহন করবো ? বিবেকবান মানুষ এ ধরনের কথা বলতে পারে না । কেননা , পরকালে আল্লাহ'র কাছে অসহায় মানুষদের দু:খ-কষ্টের জন্য আমাদেরকে দায়বদ্ধ হতে হবে। যারা এমন সব মতাদর্শ প্রচার করে যাতে সন্ত্রাস , মানুষের প্রতি নিষ্ঠুরতার প্রসার ঘটে , তারা নিজেরা সরাসরি অত্যাচার না করলেও অত্যাচারীদের সাথে একই কাতারে তাদের স্থান। যারা এসব মত ও আদর্শের প্রচারের বিরোধীতা করে না , তারাও এসব দুর্দশার জন্য দায়ী। ধর্মবিশ্বাসীদের প্রতি অবিচল না থাকলে দায়িত্ব জ্ঞানহীন মানুষেরা এমন এক সমাজ তৈরী করে , যেখানে মানুষ ভাবে , আমার কোন দায়িত্ব নেই ; কোন কিছুর জন্য আমি কারো কাছে দায়বদ্ধ নই। এরা এমন ধরনের মানুষ , যারা নিজেদের স্বার্থ চিন্তাই আগে করে ; এবং নিজেরা কেমন করে সুন্দর করে বাঁচবে , সেই চিন্তাই তার কাছে প্রাধান্যই পায়।

বির্বতনবাদের তত্ত্ব যা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত বলে দাবী করা হয় ,সেটা বস্তুবাদীতা , ভোগবাদীতা , ধর্মহীনতার জন্ম দিয়েছে । এই মতাদর্শ দায়িত্বজ্ঞানহীন ও আদর্শহীন মানুষ তৈরী করছে। মানুষ মনে করছে তার কারো কাছেই কোন কৈফিয়ত দেয়ার নেই। বিবর্তনবাদ এটাই বলে যে , মানুষ বানরজাতীয় প্রাণীর উন্নততর প্রজাতি এবং মানুষ এ পৃথিবীতে ঘটনাচক্রে এসেছে । মানব সৃষ্টি সম্পর্কে এ ধরনের ধারণা অন্য মানুষের জন্য কষ্ট স্বীকরা করা , অন্য মানুষকে কষ্ট থেকে বাঁচানো বা দু:খী মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া ---এসব আদর্শ শিক্ষা দেয় না।
সবচেয়ে বড় কথা , বিবর্তনবাদ এটাই শেখায় যে , জীবন হলো সংগ্রাম , সেখানে যার শক্তি আছে সেই টিঁকে থাকবে । গরীব , দুর্বল এরা ধ্বংস হয়ে যাবে ; পুরো পৃথিবীতে মানুষ স্কুল , কলেজ , টিভি , পত্রিকা এবং চারপাশের মানুষ থেকে এই মতাদর্শ শিখছে।

এই মত দুর করতে এবং ক্ষমা , সহানুভূতি , সমমর্মিতা প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়োজন কুরআন ও সুন্নাহ'র আদর্শ মানুষকে জানানো । স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসহীনতা এই পৃথিবীতে ও অনন্তকালের জীবনের জন্য কী প্রচন্ড ক্ষতিকর ,তা সবাইকে বোঝাতে হবে। সব বিশ্বাসীর জন্য এটা একটা অবশ্য কর্তব্য।

যারা এই গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক দায়িত্ব পালন করে , আল্লাহ তাদের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন..." তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে , আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে , অবশ্যই তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে আধিপত্য দান করবেন , যেমন তিনি আধিপত্য দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের জন্য দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন ; এবং অবশ্যই তিনি তাদের ভয় -ভীতির পরে তা পরিবর্তিত করে দেবেন নিরাপত্তায়। তারা

আমারই ইবাদত করবে , আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না । আর যারা অকৃতজ্ঞ , তারাই তো সত্যত্যাগী" (সুরা নুর; ২৪: ৫৫) ।

আল্লাহ'র ভয় মানুষের মধ্যে না থাকলে কী হবে ?

দু'জন মানুষের কথা ভাবুন । একজন জানে যে , আল্লাহ'র সামনে তাকে একদিন হাজির হতে হবে এবং ভাল –মন্দ কাজের যথাযথ প্রতিফল তাকে পেতে হবে। আরেকজন মনে করে কারো কাছেই তার কোন জবাবদিহিতা নেই। এই দুইজনের আচার–আচরণের মধ্যে অবশ্যই অনেক তফাৎ থাকবে। আল্লাহকে যে ভয় করে, সে যে কোন অন্যায় থেকে নিজেকে দুরে রাখে এবং নিজের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সব ধরনের অনৈতিক আচরণ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে। যার মনে আল্লাহ'র ভয় নেই, সে অকারণে বা তুচ্ছ ব্যক্তিস্বার্থে মানুষকে খুন করতেও দ্বিধা করবে না। আল্লাহ ও পরকালের ভয় থাকলে এমন কোন কাজ করার সাহস তার হতো না , যার কৈফিয়ত দেয়া পরকালে তার পক্ষে সম্ভব নয়।

পবিত্র কুরআনে হযরত আদম (আ:) এর দুই ছেলের কথা বলা হয়েছে। এই কাহিনী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমন দুই ব্যক্তির প্রতি যাদের একজন আল্লাহ ভীরু , আর অন্যজনের মনে আল্লাহর সম্পর্কে ভয় নেই --" তুমি তাদের শুনাও আদমের দুই ছেলের কাহিনী। যখন তারা কুরবানী করেছিল তখন তাদের একজনের কুরবানী কবুল হয়েছিল ও অন্যজনেরটা কবুল করা হয় নি। সে বললো : অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করবো। অন্যজন বললো : আল্লাহ কেবলমাত্র বিশ্বাসীদের কুরবানী কবুল করেন। যদি তুমি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার দিকে তোমার হাত প্রসারিত করো , তবুও আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে আমার হাত প্রসারিত করবো না। কেননা , আমি তো ভয় করি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহকে " (সুরা মায়িদা : ৫: ২৭–২৮) ।

যার মনে আল্লাহর ভয় নেই , সে চোখের পলক না ফেলে আপন ভাইকে মেরে ফেলে যদিও তার ভাইয়ের কোনই দোষ ছিল না। অন্যদিকে , এই হত্যাকান্ডের শিকার যে হলো সে হত্যার হুমকির মুখেও জানিয়ে দিয়েছিল যে সে নিজের ভাইকে খুন করার চেষ্টাও করবে না। আল্লাহ ভীরুদের সার্বিক চিত্র এরকমই।

যে সমাজে মানুষের মনে আল্লাহ'র ভয় কাজ করবে , সে সমাজে আল্লাহ যা পছন্দ করেন না যেমন , খুন , অত্যাচার , অবিচার , বৈষম্য ইত্যাদি থাকবে না। ভয় ও লোভ

?? মানুষের নিষ্ঠুরতা ও অনৈতিক আচরণের জন্য অনেকাংশে দায়ী। অনেক মানুষই ভয় পায় যে তারা গরীব হয়ে যাবে বা তাদের ভবিষ্যতের কোন নিশ্চয়তা নেই । এসব ভয় থেকে ঘুষ খাওয়া , দুর্নীতি , চুরি , মিথ্যা সাক্ষ্য , পতিতাবৃত্তি ইত্যাদিতে অনেক মানুষ নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলে।

যে ব্যক্তির মনে আল্লাহর উপর বিশ্বাস আছে , সে সব সময় আল্লাহর উপর ভরসা করে ; সব কিছুর উপরে আল্লাহকে স্থান দেয়। আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হতে হবে , এমন যে কোন কাজকে সে তাই এড়িয়ে চলে। তার মনের গভীরে সে আল্লাহর ভয়কে বাড়িয়ে চলে । ক্ষুধা , দারিদ্র , মৃত্যু বা কোন দু:খ –কষ্টই তাকে আল্লাহ'র পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। আল্লাহ ভীরু কারো পক্ষেই কুরআনের পথ থেকে দুরে চলে যাওয়া কোন পরিস্থিতিতেই সম্ভব নয় । সে বিশ্বাসী , তার উপর তাই নির্ভর করা চলে । সে বিবেক অনুযায়ী কাজ করে। আল্লাহ সব দেখেন , সব শুনেন ---এটা সে জানে ও বিশ্বাস করে বলে যখন সে একদম একা থাকে , তখনও সে বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে না।

ধর্মহীনতা বিবেকহীনতার জন্ম দেয় । এটা স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্য উদাহরণ দেই এমন এক ব্যক্তির যে রাস্তায় কোন মানুষকে গাড়ি চাপা দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যেতে দ্বিধা করে না। এটা নির্দেশ করে ধর্মের পথ থেকে সে কতটা দুরে। একজন আহত মানুষকে অসহায় অবস্থায় রাস্তার মাঝখানে ফেলে পালিয়ে যে চলে যায় , সে বিবেকহীন । সে মনে করে পালিয়ে গিয়ে সে মানুষজনকে এড়িয়ে যেতে পারবে। সে এটা চিন্তা করে না যে আল্লাহ তাকে ঘিরে রয়েছেন। প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ তাকে দেখছেন , শুনছেন । একজন কখনোই আল্লাহর নজরদারী ও শেষ বিচারের দিনের শাস্তি থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারবে না।

আল্লাহ সব ধরনের অন্যায় , নিষ্ঠুরতা ও বিবেকবর্জিত কাজের বিচার করবেন –
" কোন নবীর পক্ষে সম্ভব নয় কোন কিছু অন্যায়ভাবে গোপন করে রাখা। কেউ কোন কিছু অন্যায়ভাবে গোপন করে রাখলে সে তা কেয়ামতের দিন নিয়ে আসবে। তারপর প্রত্যেককে পরিপুর্ণভাবে দেয়া হবে যা সে অর্জন করেছে এবং তাদের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ যাতে সন্তষ্ট তার আনুগত্য করে সে কি ঐ ব্যক্তির মত , যে আল্লাহ'র ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং যার আবাস জাহান্নাম ? আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল । " (সুরা আলে –'ইমরান : ৩: ১৬১–১৬২) ।

মানুষকে আল্লাহর আদেশ–নির্দেশের কথা মনে করিয়ে দিলে এবং আল্লাহ'র নির্দেশিত পথে চলার কথা বললে এ ধরনের বিবেকহীণ আচার–আচরণ বন্ধ হবে।

ধর্মের পথ থেকে মানুষ দূরে সরে গিয়ে কতটা ধর্মহীন কাজ করে তার আরো একটা উদাহরণ হলো ভুয়া চিকিৎসক। কোনরকম শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত দক্ষতা ছাড়াই এরা এমনভাবে রোগীদেরকে চিকিৎসা করে যেন তারা দক্ষ চিকিৎসক। এভাবে তারা অসহায় রোগীদের সাথে চরম প্রতারণা করে এবং রোগীদের সুস্বাস্থ্য ও জীবনকে সাংঘাতিক বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। এ নিয়ে এসব বিবেকহীন মানুষদের কোন চিন্তাই নেই। তারা শুধু বিভোর টাকা রোজগারের নেশায়।

আল্লাহ বিশ্বাসীদের নির্দেশ দিয়েছেন ....." আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদের নির্দেশ দেন যে , তোমরা আমানত পৌঁছে দাও তার প্রাপকদের কাছে ; আর যখন মানুষের মধ্যে বিচার কাজ পরিচালনা করবে তখন ন্যায়বিচার করবে। আল্লাহ যে উপদেশ তোমাদের দেন তা কত উত্তম । নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শোনেন , সব দেখেন "
(সুরা নিসা: ৪: ৫৮)।

সুস্বাস্থ্য একটি মূল্যবান নেয়ামত/ আমানত । এই আয়াতের প্রতি দুষ্টি রেখে মানুষ এমন কোন পেশায় নিজেকে জড়াবে না যা করার অধিকার তার নেই এবং যাতে অন্য মানুষের ক্ষতি হতে পারে।

জীবনের সব স্তরেই এমন অনেক বিবেকহীন মানুষদের দেখা পাওয়া যায় , যার মনে আল্লাহ'র ভয় নেই। আল্লাহ'র শাস্তির কথা এরা চিন্তা করে না বলে নিরপরাধ মানুষের নামে অপবাদ দিতে দ্বিধা করে না। সে মানুষকে বোঝায় যে সে নিজে নিরপরাধ ও বিশ্বাসী। আল্লাহ সব কিছু দেখছেন এবং কেয়ামতের দিনে সব কিছুর বিচার হবে ---এই বোধটুকু এদের নেই। এদের অপবাদের জন্য নিরপরাধ মানুষরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপন্ন হয় , অনেক সময় জেলে যায় --- এসব কোন কিছুই বিবেকহীনদের স্পর্শ করে না।

আল্লাহ এ ধরনের অপবাদকারীদের শাস্তি সম্পর্কে বলেছেন , " নিশ্চয়ই যারা এ অপবাদ রটনা করেছে , তারা তো তোমাদেরই মধ্য থেকে একটি ক্ষুদ্র দল। তোমরা এ অপবাদকে তোমাদের জন্য মন্দ বলে মনে কর না , বরং এটা তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে ততটুকু যতটুকু পাপ সে করেছে এবং তাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী ভূমিকা গ্রহণ করেছে , তার জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি " (সুরা নূর : ২৪: ১১)।

যে মানুষ আল্লাহকে ভয় করে না , সে অন্য মানুষকে শ্রদ্ধা বা মূল্যয়ন করে না। স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসহীনতার কারণেই আমরা দেখি অনেক খাবার দোকানের মালিক স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাবার সরবরাহ করে না; বেশীরভাগ মানুষই বয়স্কদের প্রতি সম্মান দেখায়

না; রোগীরা জরুরী বিভাগে যথাযথ যত্ন ও চিকিৎসার অভাবে মারা যায় ; অসহায় ও গরীব মানুষেরা তাদের সামান্য ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ হয় ইত্যাদি।

যে সমাজের সদস্যদের মনে আল্লাহ'র প্রতি ভয় আছে , সেখানে কেউ এ ধরনের কাজ করে না। কেননা , তারা সচেতন যে এই দুনিয়ায় কোন খারাপ কাজ করলে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে সেজন্য শাস্তি পেতে হবে। মানুষের মধ্যে এই ধরনের সচেতন বিবেক কাজ করলে সমাজে শান্তি , শৃঙ্খলা , ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা পায়। সব ধরনের লাম্পট্য , পতিতাবৃত্তি ও অনৈতিক আচার-আচরণ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রেখে যদি পরস্পরের প্রতি সম্মান , সহানুভূতি ও ক্ষমার মনোভাব প্রদর্শনকরা হয় , তাহলে তা সুন্দর পরিবার সৃষ্টির পাশাপাশি সুদৃঢ় সমাজও প্রতিষ্ঠা করবে । সমাজ তখনই এ ধরনের নির্ভরযোগ্য , সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় যখন মানুষ একে অন্যের প্রতি আন্তরিকতা দেখাবে।

প্রতিদানের আশা না করে ভাল কাজ করা:

যে আল্লাহকে ভয় করে , সে নিজের বিবেকের কথা শুনে এবং সবসময় কুরআনের আদর্শে পথ চলে ; পাক কুরআনে আল্লাহ আদেশ করেন , এই দুনিয়ায় তাৎক্ষণিক লাভের আশা না করে মানুষ যেন অন্যের উপকারে ভাল কাজ করে।

দু:খী মানুষকে সুন্দর একটি জীবন উপহার দেয়ার জন্য বিশ্বাসীদেরকে সংগ্রাম করতে হবে। সুরা মুদাসসির এ আল্লাহ বলেন , " আর বেশী পাওয়ার আশায় কাউকে কিছু দান করবে না " (৭৪:৬) ---এই আয়াতে এটাকেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যেন মানুষ দুনিয়ার পুরস্কারের লোভে কিছু না করে বরং আল্লাহ'র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ভাল কিছু করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ মেনে চলে ও দুনিয়ায় লাভের আশা করে না , সে একটি উদ্দেশ্যেই এসব কিছু করে ---তা হলো আল্লাহ'র সন্তুষ্টি অর্জন। আল্লাহ যেন তাকে বেহেশতের বাগানের বান্দা হিসাবে গ্রহণ করে নেন।

ভাল অনেক কাজ এখন করা হয় দুনিয়াতে পুরষ্কার পাওয়ার লোভে। যেমন , কখনো কখনো কোন ধনী ব্যাবসায়ী গরীবদের জন্য বাসা বানিয়ে দেয় তথাকথিত সাহায্যের নামে। এমন ভান করা হয় যেন তার নিজের এতে কোন লাভ নেই। কিন্তু এটাই সত্যি যে , সে আসলে প্রচারের লোভেই এসব করে। তার দানের খবর ফলাও করে পত্র-পত্রিকায় , টিভির পর্দায় আসে ; তার চেহারা বারবার দেখানো হয় , বড় করে নাম ও ছবি ছাপা হয় ; ফলে তার সাহায্য আসলে রুপান্তরিত হয় নিজের প্রদর্শণীতে। একই সাথে , তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এই সাহায্য থেকে নিজেদের অনেক টাকা বাচিয়ে ফেলে ; কেননা , এই সাহায্যের টকার আয়কর থেকে বাদ যায় ।

অনেক সময় , সাহায্য প্রার্থীর যা দরকার , প্রকৃত সাহায্য সেভাবে দেয়া হয় না। যেমন , ভুমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় ট্রাক ভর্তি খাবার পাঠানো হলো । কিন্তু , দেখা গেল পঁচা –বাসী খাবার পাঠানো হয়েছে অথবা সবচেয়ে জরুরী যে জিনিষ তা না পাঠিয়ে এমন কিছু পাঠানো হলো যার আসলে তেমন দরকার ছিল না।

রাজনীতিবিদদের মনোভাব ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। রাজনীতিবিদরা সবসময় বড় গলায় প্রচার করে যে দেশ ও দেশের মানুষের জন্য তারা কতটা নিবেদিতপ্রাণ ; কিন্তু যদি তারা মন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত না হয় , তখন তারা আর সেভাবে দেশ ও দলের স্বার্থে কাজ করে না। এতেই বুঝা যায় , তারা মুখে যা বলে ও প্রচার করে , তার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো ক্ষমতা ও সম্মান অর্জন। এ ধরনের মন–মানসিকতার ফলে সমাজের প্রকৃত উপকার কমই হয়। সংক্ষেপে বলা যায় , এসব কাজের মুল্য পরকালে বিফলে যায়।

আল্লাহ বলেন , “ হে মুমিনগণ ; যারা ঈমান এনেছ ; তোমরা দানের কথা প্রচার করে ও কষ্ট দিয়ে তোমাদের দানকে ঐ লোকের মত বরবাদ কর না যে নিজের সম্পদ লোক দেখানোর জন্য খরচ করে এবং আল্লাহ’র প্রতি ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না। ঐ লোকের তুলনা একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর কিছু মাটি ছিল , তারপর এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হল ; ফলে তাকে পরিষ্কার করে রেখে দিল। যা তারা উপার্জন করেছিল , তার কিছুই তারা কাজে লাগাতে পারবে না। আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে পথ দেখান না ” (সুরা বাকারা , ২: ২৬৪) ।

মানুষকে সাহায্য করার ও আল্লাহ’র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করলে পরকালের জন্য তা লাভজনক , কল্যাণকর। এটা আল্লাহ’ তালা কুরআনে অনেকবার বলেছেন , আন্তরিক মনোভাবের প্রতিফল হিসাবে আল্লাহ মানুষকে সাফল্যের পথে নিয়ে যান ; “ যারা আল্লাহ’র সন্তুস্টি অর্জনের লক্ষ্যে ও নিজেদের চিত্ত সৃদৃঢ় করার জন্য নিজ সম্পদ ব্যয় করে , তাদের উদাহরণ কোন উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত বাগানের মত; যেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়; ফলে ফলমূল দ্বিগুণ জন্মে। আর যদি প্রবল বৃষ্টি নাও হয় তবুও হালকা বর্ষণই যথেষ্ট। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সব দেখেন ”
(সুরা বাকারা ২: ২৬৫)।

যে মানুষ শুধুমাত্র আল্লাহ'র সন্তুষ্টি চায় , সে নিজেকে ভাল কাজ করা থেকে দুরে রাখে না ও এজন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে। যে সমাজ ধর্ম থেকে অনেক দুরে অবস্থান করে , খুব স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার মানুষের মনে অবিশ্বাসের বীজ বপন করা হয় এবং যে কোন ত্যাগের পিছনে তারা স্বার্থের সন্ধান করে; স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন সে সমাজে প্রাধান্য পায় না , সেখানকার মানুষ ব্যক্তি স্বার্থকে সবার উপরে প্রাধান্য দেয়।

অন্যদিকে , যারা ধর্মে বিশ্বাসী তারা আর কিছুই চায় না বরং আল্লাহকে সন্তুষ্টিই তাদের কাম্য থাকে --"(সৎ কর্মশীলগণ হল তারা , যারা) মান্নত পূরণ (কর্তব্য পালন) করে ও তারা সেদিনকে ভয় করে যেদিনের অনিষ্ট অনেক বিস্তৃত। আর তারা আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্বেও মিসকীন , ইয়াতীম ও বন্দীদেরকে খাদ্য দান করে। (তারা বলে) , 'আমরা তো শুধু তোমাদেরকে আল্লাহর সন্তুস্টির জন্যই খাদ্য দান করি , আমরা তোমাদের থেকে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা আশা করি না। আমরা আশংকা করি আমাদের প্রতিপালকের কাছে থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের । ' অতএব , আল্লাহ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন ও তাদেরকে দান করবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ .. " (সুরা ইনসান /দাহ্‌র , ৭৬: ৭-১১)।

যে সব সমস্যার সমাধান জরুরীভিত্তিতে এখনই হওয়া দরকার , সে বিষয়ে আল্লাহর আদেশ-নির্দেশের আয়াতগুলির বিস্তারিত বিবরণ এই বইয়ের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে দেয়া হয়েছে। এটা পড়ার সময় দয়া করে মনে রাখবেন ,কুরআনের আলোকে জীবনকে সাজালে সব সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধান হবে।

বর্তমান সময়ে অসংখ্য বিষয় জট বেঁধে এক তিক্ত অচল অবস্থার সৃস্টি হয়েছে। অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে কয়েকটি হলো: দু:স্থ -অভাবীদের বেঁচে থাকার মৌলিক প্রয়োজনগুলি পূরণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ ; বৃদ্ধদের যথাযথ চিকিৎসা ও সেবা-যত্নের ব্যবস্থা গ্রহণ ; শিশু -কিশোরদের মনে ভাল চিন্তা- আদর্শের বীজ বপন করা ; প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় জরুরী সাহায্য পাঠানো; তরুণদের মধ্যে যে সব ভুল ধারণা তাদেরকে বিপথে নিয়ে যায় , সেসব দুর করা; যে সব প্রচলিত ভ্রান্ত , নিষ্ঠুর মতাদর্শ যুদ্ধ ও হাজারো নিরপরাধ মানুষের হত্যার জন্য দায়ী , সে সব মত ও আদর্শকে ছুঁড়ে ফেলা ; যারা নিজেদের দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে কাজ করে , তাদের মোকাবেলা করা ইত্যাদি।

আল্লাহ মানবজাতির জন্য উজ্জ্বল আলোর মত পথ প্রদর্শণকারী কুরআনকে পাঠিয়েছেন । বিভিন্ন সমস্যার সমাধান একমাত্র এই পথ-নির্দেশনায় আছে। তাই একমাত্র কুরআনের আনুগত্য করলে জীবনে যা যা সমস্যার মুখোমুখি আমরা হই , তার থেকে রক্ষা পাবো। আল্লাহ'র নির্দেশিত নীতিমালা মেনে চললে এই দুনিয়ার বুক থেকে সব ধরনের অশুভ কিছু দুর হয়ে যাবে। যদি অন্য কিছু করা হয় , তবে মানুষ স্বেচ্ছায় নিজেদেরকে নিষ্ঠুর এক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে যাবে। মানুষ যে নিজেই নিজের ক্ষতি , এই ব্যপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহ বলেন , মানুষের কৃতকর্মের দরুণ স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে ; যার ফলে মানুষকে তাদের কোন কোন কাজের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান ; যাতে তারা ফিরে আসে (সুরা রুম; ৩০ : ৪১) ।

প্রজ্ঞাময় সমাধান:

বিভিন্ন সমস্যা যার কারণে পৃথিবীর পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে , সে সব দুর করে মানবতার জন্য কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসতে প্রয়োজন সেই ধরনের সমাধান যাতে রয়েছে ---জ্ঞান , অন্তর্দৃষ্টি , বিচক্ষণতা ইত্যাদি। এই সব বৈশিষ্ট্য তখনই অর্জন সম্ভব যখন কুরআনকে অনুসরণ করা হয়। স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস থেকে মানুষ সে জ্ঞান অর্জন করে। আল্লাহ এর উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন , " হে মুমিনগণ; তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর , তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ন্যায় ও অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দান করবেন , তোমাদের পাপ মিটিয়ে দেবেন। তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ হলেন অত্যন্ত মঙ্গলময় " (সুরা আনফাল ; ৮: ২৯)।

মানুষ যে সব সমস্যার মুখোমুখি হয় , অনেক সময় সে সবের সমাধানের জন্য নিজেই উদ্যোগী হয়। যদিও তারা কাঙ্খিত লক্ষ্যে পোঁছাতে ব্যর্থ হয় ; কেননা , ধর্ম বিশ্বাস থেকে যে স্বত:স্ফূর্ত জ্ঞান , প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায় , এ সব মানুষ সে সব থেকে বঞ্চিত। সেজন্য , সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশ্বাস থেকে যে আবেগময় আগ্রহ ও উদ্দীপনা বিশ্বাসী মানুষের মনে কাজ করে , সেটাও স্রষ্টার অস্তিত্বে অবিশ্বাসীদের মধ্যে থাকে না।

তাই যখন সমস্যা সমাধানের সময় তারা সময়মত পথ খুঁজে পায় না , অনেক সময় বিভিন্ন সমস্যা জট পাকিয়ে একেবারে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেমন , সারা পৃথিবীতে অসংখ্য গৃহহীন শিশু এবং ইয়াতীমরা রাস্তায় রাস্তায় জীবন কাটায়। এই পথ শিশুরা যেন অপরাধ চক্রের সাথে জড়িয়ে না পড়ে এবং নেশাখোর না হয়ে পড়ে , সেজন্য অনেক ধরনের কর্মসূচীই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু , এসব প্রায় সময়ই ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়। তাই এই শিশুরাও ধীরে ধীরে অপরাধ জগতের বাসিন্দা হয়ে যায়।

কখনো বা অবহেলা ও অযত্নে এসব অনেক শিশু আত্মহত্যা করে বা মারা যায়। বিভিন্ন কর্মসূচীর পাশাপাশি যদি এসব শিশুদের মনে কুরআনের আলো জ্বেলে দেয়া যেত , তাহলে অবশ্যই পরিস্থিতি অন্য রকম হতো। ছোট থাকতেই আল্লাহকে ভয় করতে শিখলে , এরা কেউ অপরাধের দিকে ঝুঁকে পড়তো না। এছাড়া , এই শিশুরা এমন মানুষদের মাঝে বড় হতো , যারা নিজেরা দেশ ও জাতিকে সর্বোচ্চ সেবা দেয়ার জন্য সংগ্রাম করে।

আরেকটি উদাহরণ এই বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করবে । অনেক অসুস্থ মানুষ আছে , যাদের ভাল হতে অনেক টাকা দরকার। যারা ধনী তাদের টাকা খরচ করতে কোন অসুবিধা নেই ; উন্নত চিকিৎসায় তারা ভাল হয়ে যায় ; কিন্তু যারা গরীব তারা বলতে গেলে বিনা চিকিৎসায় মারা যায় । এসব দেখে কেউ বিচলিত হয় না। সেজন্য কেউ এই অবস্থা দুর করতে কার্যকরী কিছু করছেও না। আল্লাহ 'র ভয় , ধর্মীয় প্রজ্ঞা মানুষের মধ্যে না থাকায় এমনটি হচ্ছে।

যারা ভাল ও খারাপের তফাৎ করতে পারে না , তারা এসব সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়। অবিশ্বাসীদের মধ্যে ভাল-মন্দের পার্থক্য না বোঝার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। আল্লাহ বলেছেন এই মানুষরা কী আচরণ করে থাকে -" যারা কুফরী করে তাদের উপমা যেমন কোন মানুষ এমন কিছুকে ডাকে যা হাঁক-ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনে না---বধির , মুক , অন্ধ ; সুতরাং তারা কিছু বুঝবে না " (সুরা বাকারা; ২: ১৭১)।

কুরআন ও সুন্নাহ'র আদর্শ মেনে চলে যে সব মানুষ , তারা জ্ঞানের আলোয় সম্পদের উন্নয়ন ও যথাপথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে সমাধানের ব্যবস্থা করতে পারেন। যে সব সংস্থা এ ধরনের মানুষের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় , তারা এসব হতভাগ্যদের ভাগ্য উন্নয়নে অনেক অবদান রাখতে পারেন। প্রথমত: মানুষকে সতর্ক করতে হবে এসব সমস্যার ভয়াবহতার ব্যাপারে; তাদেরকে জানাতে হবে সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে। যেমন , কিছু ধনী ও ধর্মভীরু ব্যবসায়ী গৃহহীন বাচ্চাদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র বানাতে পারেন এবং তাদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। এ ব্যবস্থা করতে যে কোন সাধারণ সংস্থাই যথেষ্ট।

কুরআনের আদর্শে গড়া একটি সমাজে এ ধরনের সমস্যা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে এ ধরনের বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য। প্রতি স্বচ্ছল পরিবার একটি করে গরীব বাচ্চার পড়াশোনার দায়িত্ব নিতে পারে।

এ ধরনের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে কুরআনের মূল্যবোধ ও প্রজ্ঞায় বেড়ে উঠা মানুষেরা সব ধরনের সমস্যারই মোকাবেলা করতে সক্ষম। একইভাবে , গরীব রোগীদের জন্য একটি চিকিৎসা ফান্ড গঠন করা যায়। এজন্য , গঠণমূলক ও উৎপাদনশীল খাতগুলিতে পৃথিবীর সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে ; সম্পদের তিলমাত্র অপচয় করা যাবে না।

আল্লাহ কুরআনে মানুষের কাছ থেকে এ ধরনের আচরণ দাবী করেন। যে সব মানুষ ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করেন , তারা নিজেদের বুদ্ধি ও বিবেক দিয়ে দ্রুত যে কোন সমস্যার অচলাবস্থাকে চিহ্নিত করবেন এবং সমাধান করবেন। অনেক সময় মানুষ বুঝতে ব্যর্থ হয় কোথায় একটি ব্যবস্থার বার্থতা বা তারা ভান করে না বোঝার। কখনো যদি পরিস্থিতি তাদের মনে বিবেকের তাড়না বা অনুশোচনার সৃষ্টি করে , তখনো তারা বুঝতে পারে না কী করা উচিৎ অথবা কোন উদ্যোগ নেওয়ার জন্য তারা খুবই অলস।

তারা মনের শান্তি নষ্ট করতে চায় না ; তাই বেশীক্ষণ এর পেছনে তারা সময় ও শ্রম নষ্ট করে না। যার যেমন সাধ্য রয়েছে , তাকে দিয়ে যদি সেরকম কাজ বিবেকবান ও জ্ঞানী মানুষরা করাতে পারেন , তবে পাহাড় প্রমাণ সমস্যারও খুব দ্রুতই সমাধান সম্ভব।

মানুষকে ভাল কাজে উৎসাহ দেয়াটা কুরআনে অত্যন্ত প্রশংসা করা হয়েছে– “কেউ কোন ভাল কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে ও কেউ কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে। আল্লাহ সব বিষয়ে নজর রাখেন ” (সুরা নিসা; ৪: ৮৫)।

এর বিপরীত আচরণকে বলা হয়েছে অবিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য এবং একে অন্যায় বলা হয়েছে– “ ...বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান করো না ও তোমরা অভাবীদেরকে খাদ্য দানে একে অন্যকে উৎসাহ দাও না , এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ পুরো খেয়ে ফেলো .. ” (সুরা ফজর; ৮৯ : ১৭–২০) ।

কুরআনের আদর্শে জীবন গড়লে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়:

" নিশ্চয়ই আল্লাহ আদেশ করেন ন্যায়বিচার , ভাল আচরণ এবং আত্মীয়স্বজনকে দান করার। আর তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা , অসঙ্গত কাজ ও অবাধ্যতা করতে। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো "

(সুরা নাহল ; ১৬ : ৯০)।

সুশৃঙ্খল সমাজ-ব্যবস্থা গড়তে ন্যায়-বিচার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রত্যেক দেশেই নিজস্ব বিচার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় নানা দোষ ও ব্যর্থতা রয়েছে। সে কারণে , একটি আদর্শ বিচার ব্যবস্থার সন্ধান করে ফেরাটা শেষ হচ্ছে না।

আদর্শ বিচার ব্যবস্থার মুল বৈশিষ্ট্য হলো: এমন একটি রীতি চালু করা যেখানে প্রত্যেকে নিজের কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। কেউ কোনরকম অন্যায় বা বৈষম্যের শিকার হবে না। যদিও নতুন , নতুন পদ্ধতি গ্রহণ , বিভিন্নভাবে তার প্রয়োগ করা ; নানা ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ সমানে চলছে, তবুও যথার্থ ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করা এখনো বহু দুরের বিষয় হয়ে রয়েছে।

এ ধরনের পরিস্থিতির জন্য সমাজের নৈতিকতার অধ:পতন অনেকটাই দায়ী । আল্লাহ'র নির্দেশিত মুল্যবোধকে স্বীকৃতি না দেয়ার একটি সাধারণ পরিণাম হলো এই অধ:পতনের জন্য সমাজে জুয়াচুরি , ঘুষ , প্রতারণা , অবিচার ও নানা ধরনের অশুভ কাজ চালু হয়ে যায় । আমাদের রোজকার জীবনেই এ ধরনের উদাহরণ প্রচুর রয়েছে। ব্যবসা জগতে এ ধরনের ঘটনা অহরহ ঘটে যে , কোন প্রতারক তার ব্যবসায়ের অংশীদার বা বন্ধুকে ঠকিয়ে তার টাকা-পয়সা , বাড়ি-ঘর , দামী গাড়ি আত্মসাৎ করে নিচ্ছে। দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব , বন্ধুর জাগতিক ও মানসিক ক্ষতি ইত্যাদি কোন কিছুর ভাবনাই প্রতারককে বিচলিত করে না।

বন্ধুত্ব , পারিবারিক মুল্যবোধ , ধর্মীয় চেতনা , সামাজিক সম্পর্ক , উত্তম নৈতিকতা ইত্যাদির কোন মুল্যই ব্যক্তিস্বার্থে এই প্রতারক দেয় না। যে কোন ধরনের সম্পর্কই এই ব্যক্তিটি কারো সাথে প্রতিষ্ঠা করে ,তা হয় সেই একই মতাদর্শে কেননা আল্লাহ যে তার কৃতকর্ম সম্পর্কে সব জানেন ও একদিন যে তাকে সবকিছুর জন্য দায়বদ্ধ হতে হবে , সেই বোধটুকু এই মানুষটির কাজেকর্মে মোটেও প্রতিফলিত হয় না।

তার কখনো মনে হয় না যে প্রতারণা একটি অন্যায় অনৈতিক কাজ ও মানুষের সাথে অবিচারের সামিল। নীচের উদাহরণ বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। যে মানুষ বিশ্বাস করে , প্রতারণা একটি জঘন্য অপরাধ , সে সবসময় এই অপরাধ থেকে নিজেকে দুরে রাখবে। লোভে পড়ে ব্যক্তিস্বার্থে কেউ যদি কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা স্বাক্ষ্য বা নিরপরাধ কারো নামে নিন্দা রটায় , তখন সে কোন না কোন একটা অজুহাতের আশ্রয় নেয়। কিন্তু , যে কারণেই সে এমনটি করুক না কেন , নিরপরাধ কারো বিরুদ্ধে বদনাম রটনা সব ক্ষেত্রেই মন্দ একটি কাজ।

উপরে বর্ণিত প্রতারণামূলক চিত্র সমাজে তখনই বেশী করে দেখা যায় , যখন মানুষ ভয় পায় যে তাদের স্বার্থ বিপন্ন হতে চলেছে। এই যুক্তি বা অনুভূতি চোর , প্রতারক , নির্যাতনকারীদের জন্য প্রযোজ্য।

নানা ধরনের স্বার্থপর চিন্তা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের নৈতিকতাহীন মানুষ সে সমাজে বাস করে , সেখানে অবিচার , স্বার্থের সংঘাত , বিশৃঙ্খলা কিছুতেই এড়ানো যাবে না। তবে , যত ধরনের প্রলোভই থাকুক না কেন , যে মানুষটি কুরআনের আদর্শে জীবন কাটায় , সে কখনোই নিজেকে একদম নীচু স্তরে নামিয়ে এনে অন্যায় কাজে লিপ্ত হবে না বা এমন কিছু করবে না , যা কুরআনের আদর্শের সাথে মিল খায় না। যার মনে আল্লাহ'র সম্পর্কে প্রচন্ড ভীতি রয়েছে , সে কখনোই এটা ভুলবে না যে তার জীবনের সব কাজের এবং সব কথারই হিসাব আল্লাহ'র কাছে আছে।

মূল্যবোধের অবক্ষয় যখন ঘটে অর্থাৎ মানুষ যখন নিজের স্বার্থকেই বেশী প্রাধান্য দেয় , তখন তার প্রতিফলন ঘটে নানা ধরনের অবিচারের মধ্য দিয়ে। নিজের সম্পদ বাড়ানো ও রক্ষা করতেই অনেক মানুষ সদা-সর্বদা ব্যস্ত থাকে। অভাবীদের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে তারা। বিপন্নকে সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে আসে না।

এ সবের একমাত্র সমাধান হলো: মানুষের মধ্যে কুরআনের আদর্শ ও মূল্যবোধকে ছড়িয়ে দেয়া। কেননা , কুরআনে আল্লাহ ন্যায়-বিচার করতে ও শ্রেষ্ঠতর আদর্শ মেনে চলতে বিশ্বাসীদের হুকুম দিয়েছেন .... " ওহে যারা ঈমান এনেছো। তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকো ; আল্লাহ'র ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান করো যদিও তাতে তোমাদের নিজের কিংবা পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনের ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী অথবা গরীব হয় , আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্খী তোমার চেয়ে বেশী। অতএব , তোমরা বিচার করেত গিয়ে রিপুর কামনা বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলো কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও , তবে আল্লাহ তোমাদের সব কাজ সম্পর্কেই জানেন (সুরা নিসা : ৪: ১৩৫)।

“ নিশ্চয়ই আল্লাহ আদেশ করেন ন্যায়বিচার করার ও সদাচরণের এবং আত্মীয়স্বজনকে দান করার। আর তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা , অসঙ্গত কাজ ও অবাধ্যতা করতে। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো ” (সুরা নাহল ; ১৬ : ৯০)।

যে সমাজে ন্যায়বিচার সম্পর্কে মানুষ কুরআনের উপরে উল্লেখিত আয়াতগুলি থেকে শিক্ষা নেয় , সেখানে অন্যায়-অবিচার হয় না। কারন , যেখানে কুরআন ও সুন্নাহ’র আদর্শ প্রতিফলিত হয় , সেখানে দৃঢ়তার সাথে ন্যায়ের চর্চ্চা করা অপরিহার্য। সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সময় অপরাধীর পরিবার , আত্মীয়স্বজন , সামাজিক মর্যাদা বা অন্য কোন কিছু প্রভাব বিস্তার করবে না। এখনকার সমাজব্যবস্থায় আইনের প্রয়োগ একেক জায়গায় একেকভাবে করা হয় । অনেক সময় , টাকা-পয়সা ও সামাজিক প্রতিপত্তির কারণে অনেক অপরাধী নামমাত্র শাস্তি পায় বা কখনো তার অপরাধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। যে সমাজে ন্যায়বিচার আছে , সেখানে কোন অপরাধী অর্থ , সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তির কারণে শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। সন্তান , সম্পদ , মর্যাদার কারণে কখনোই ন্যায়ের পথ থেকে সরে আসা যাবে না।

ন্যায়বিচার না থাকলে সমাজে কী কী সমস্যা দেখা দেয় ?

১. মিথ্যা শপথ ও মিথ্যা সাক্ষ্য দান বেড়ে যাবে- ন্যায়বিচার করার জন্য সত্য কী , সেটা জানতে হয়। তাই সাক্ষীরা এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করে অনেক কেসের মীমাংসা সহজেই করা যায় । যে সমাজে কুরআন ও সুন্নাহ’র আদর্শের প্রতিফলন নেই , সেখানে সাক্ষীদের কথার উপর ভিত্তি করে সত্যকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় না। কারণ যার মনে কুরআন ও সুন্নাহ’র আদর্শ নেই , সেই মানুষ টাকা বা অন্য কোন সুযোগের লোভে অনায়াসে মিথ্যা বলবে । শ্বাস-প্রশ্বাসের মত অতি স্বাভাবিক কাজের মত সে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে। এটা করার সময় ভাল ভাল সব আদর্শকে মিথ্যাবাদী মুখ ফিরিয়ে নেয় ; যেমন , সত্য কথা বলা , নিরপরাধ মানুষের পক্ষ অবলম্বন করা ইত্যাদি। কখনো কখনো মানুষ বিভিন্ন কেসে সাক্ষ্য দেতে যায় না ; যদিও তার সাক্ষ্য হয়তো ঐ নির্দিষ্ট কেসটির মীমাংসার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অযৌক্তিক কিছু অজুহাত কল্পনা করে নিয়ে মানুষ এমন করে। যেমন, কোন ঝামেলায় যাতে না পড়তে হয় বা কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি যেন না হতে হয় ইত্যাদি।

আল্লাহ কুরআনের আয়াতে সত্য প্রকাশের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন .. " আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করবে না। যে কেউ তা গোপন করবে , অবশ্যই তার অন্তর হবে পাপপূর্ণ । তোমরা যা করো , সে বিষয়ে আল্লাহ সবই জানেন " (সুরা বাকারা ; ২: ২৮৩)।

কারো প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের জন্য অনেক সময় মানুষ প্ররোচিত হয় মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে। মিথ্যা কথা বলে ও প্রকৃত তথ্যকে বিকৃত করে এরা ন্যায়বিচারের পথে বাধার সৃষ্টি করে। সত্য কথা বলার তাগিদ হাদীসেও এসেছে। আল্লাহর রাসুল হযরত
মুহাম্মাদ (দ:) বলেছেন , সত্যের পথে অবিচলিত থাকো , কেননা সত্য সৎ কাজের দিকে নিয়ে যায় ও সৎ কাজ মানুষকে নিয়ে যায় বেহেশতের বাগানে। যদি কোন মানুষ সবসময় সত্য কথা বলে ও সত্যকেই তার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করে , আল্লাহর উপস্থিতিতে তাকে উচ্চ মর্যাদাশীলদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

তোমরা মিথ্যাকে ত্যাগ করো ;কেননা মিথ্যা খারাপ কাজের পথে নিয়ে যায় এবং খারাপ কাজ মানুষকে আগুনের মধ্যে নিয়ে যায়। যদি কোন মানুষ সবসময় মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যাকে নিজের লক্ষ্য বানিয়ে ফেলে , তবে আল্লাহ'র উপস্থিতিতে তাকে প্রচন্ড মিথ্যুক হিসাবে গণ্য করা হবে। – টীকা ১ (মুসলিম ; খন্ড ৪ , হাদীস ৬৩০৯)

যে মানুষেরা কুরআন ও সুন্নাহ'র আদর্শে বাস করে না , তারা ন্যায়বিচার করে না। বিশেষ করে , যখন তাদের নিজেদের স্বার্থ ও আবেগ এতে জড়িত থাকে। তারা কখনো মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার পরিণামের কথা চিন্তা করে না। তাদের একবারো মনে হয় না যে , বিচার অনেক দিন ধরে চললে একজন নিরপরাধ মানুষকে বন্দীদশায় কত না কষ্ট পেতে হয়।

একজন নিরপরাধী যখন মিথ্যা মামলায় জেল খাটে , তখন তার পরিবারের সদস্যদের কত না ভোগান্তি হয়। মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা এই সব নিরপরাধ দন্ডিত মানুষদের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করে না এবং চিন্তা করে না যে এই অবস্থা তার নিজের ভাগ্যে ঘটলে তখন কেমন লাগতো।

মানুষ বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করে , কুরআনে আল্লাহ তাকে বিশেষ বিবেচনায় নিয়েছেন ও নির্দেশ দিয়েছেন যে পরিস্থিতি যাই থাকুন না কেন , ন্যায়বিচার করতে হবে –" হে মুমিনগণ , তোমরা আল্লাহ'র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানের

ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার করো এটাই তাকওয়ার (আল্লাহ ভীতির) নিকটতর। আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করো , নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে সব কিছু জানেন" (সুরা মায়িদা ; ৫: ৮) ।

অবিচার যাতে না হয় , সেজন্য আল্লাহর রাসুল হযরত মোহাম্মদ (দঃ) বলেছেন , যখন রেগে আছো , তখন বাদী-বিবাদীর মধ্যে বিচার-ফায়সালা করবে না - টীকা ২ (মুসলিম ; খন্ড ৩, হাদীস ৪২৬৪) ।

কখনো ভয়ে , কখনো লোভে পড়ে কিছু মানুষ সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে দুরে সরে যায়। একমাত্র কুরআনের আদর্শই তাদেরকে সঠিক পথ-নির্দেশনা দিতে পারে। ভয়-ভীতি বা প্রলোভন --কোন কিছুই একজন মানুষকে অন্যায় কিছু করতে দেবে না ; কেননা , সে জানে যে আল্লাহ তাকে প্রতি মুহূর্তে ঘিরে রয়েছেন। বিশ্বাসীরা জানে যে , কেয়ামতের দিন তাদের প্রতিটি খারাপ কাজ ও প্রত্যেকটি খারাপ কথার জন্য আল্লাহ'র কাছে দায়ী হতে হবে।

আল্লাহ বলেন , পরম করুণাময়ের দাসেরা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না- " যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যদি বেহুদা আমোদ-প্রমোদে গিয়ে পড়ে , তবে ভদ্রভাবে তা এড়িয়ে চলে। " (সুরা ফুরকান: ২৫: ৭২)

আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য ; তা হলো -যারা ন্যায়ের থেকে ব্যক্তি স্বার্থকে বেশী গুরুত্ব দেয় , একদিন তাদেরও একই ধরনের বিপদ ঘটতে পারে। সেদিন নিশ্চয়ই অবিচারের শিকার হয়ে তারা খুবই অশান্তি ভোগ করবে এবং নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর খোঁজে তাদেরকে বের হতে হবে , যে সত্যকে বিকৃত করবে না। যারা এই ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে চান না , তাদের উচিৎ আল্লাহ'র আদেশের কথা প্রচার করা ও কঠোরভাবে কুরআনের মুল নীতিগুলির মেনে চলা ।

২। টাকা ও পদ-মর্যাদা দিয়ে মানুষকে বিচার করা:-

যে সমাজে কুরআন ও সুন্নাহ'র আদর্শে পরিচালিত হয় না , সেখানে মানুষকে যাচাই করার প্রধান মানদন্ড হয় টাকা ও সামাজিক মর্যাদা। সব ধরনের মানুষের মধ্যে এই মানসিকতা

ছড়িয়ে পড়ে। যেমন, ক্রেতাদের প্রতি দোকানীদের মনোভাব ও আচরণ বিশ্লেষণ করলে এটি বোঝা যাবে।

একই সময়ে একটি দোকানে দু'জন ক্রেতা এলেও দোকানী সেই ক্রেতার দিকেই বেশী মনোযোগ দেবে , যে ধনী। অন্য ক্রেতা যাকে দেখে ততটা ধনী মনে হচ্ছে না বরং একটু মধ্যবিত্ত বা গরীবই বলা চলে , সে একই জিনিষ একই দামেই কিনবে তবুও সে দোকানীর কাছ থেকে ততটা ভদ্র ও সম্মানজনক আচরণ পাবে না। পোশাক ও চাকচিক্য দেখে দোকানী ক্রেতার সাথে কী আচরণ করবে , তা ঠিক করে।

মানুষকে সম্মান করার এই যে মাপকাঠি , তা যে মানুষ কুরআনের আদর্শে চলে তার জন্য প্রযোজ্য নয়। যে বিশ্বাসী সে অন্য একজনের সাথে ভাল ব্যবহার করে শুধুমাত্র এইজন্য যে , সে " মানুষ " । কোন ক্ষতিকর বৈষম্য নীতি দিয়ে সে তার চারপাশের মানুষকে বিচর করে না। কাউকে সম্মান দেখানোর জন্য তার এ রকম কোন প্রতীকের প্রয়োজন নেই। একজন ধনী হোক্ বা গরীব , কুঁড়ে ঘরে থাকুক বা প্রাসাদে ---তাতে কিছুই যায় আসে না। একজনের দামী পোশাক , সুন্দর চেহারা , নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক কোন ডিগ্রী , সামাজিক অবস্থান অথবা অন্য কোন মর্যাদার প্রতীক ধর্মবিশ্বাসীর কাছে কোন মুল্য নেই। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন , মানুষকে ভালবাসার মাপকাঠি হলো আল্লাহ'র প্রতি তার বিশ্বাস ও নৈকট্যের মাত্রা।

৩। শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যা :

সব মানুষেরই অধিকার আছে শিক্ষা গ্রহণের । ধর্ম , ভাষা , বর্ণ বা সামাজিক অবস্থান যাই হোক না কে , প্রত্যেকেই জ্ঞান চর্চ্চা করার দাবী রাখে। সামাজিক অবিচার অবশ্য এমনটি হতে দেয় না। এক্ষেত্রে এমন সব সমস্যার উদ্ভব হয়েছে , যার সমাধান জরুরীভিত্তিতে হওয়া দরকার। এক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রধান সমস্যা হলো , সমাজের প্রতিটি সদস্যের জন্য বিনা বেতনে পড়াশোনার সুবিধা না থাকা।

অনেক দেশেই অভাবের কারণে অসংখ্য শিশু , কিশোর সুশিক্ষা পায় না। অল্প কিছু ভাল স্কুল সংরক্ষিত থাকে সমাজের সংখ্যালগিষ্ঠ ধনী পরিবারের সন্তানদের জন্য। সাধারণ পরিবারের বাচ্চারা খুব কমই তাদের যেমনটি প্রয়োজন তেমন শিক্ষা পায় না। এই প্রেক্ষাপটে , ধনীরা তুলনামূলকভাবে উন্নত শিক্ষা পায় , যখন গরীবরা সেটুকুই পায় যতটুকু প্রচলিত সমাজব্যবস্থা তাদেরকে দিয়ে থাকে।

ভাল স্কুলে গবেষণাগার ও অন্যান্য পর্যাপ্ত শিক্ষামূলক উপকরণের সাহায্য বাচ্চাদের পড়াশোনা ভাল হয়। অন্যদিকে কিছু স্কুলে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা না থাকায় তা বাচ্চাদের অগ্রগতির পথে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করে। যে যেই ক্ষেত্রে পড়াশোনা করতে চায় ,সেই বিষয় নিয়ে তাকে পড়তে দেয়া উচিৎ। এটা প্রমাণিত , যে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা নিজেদের পছন্দমত বিষয় নিয়ে পড়তে পারে। সেখানে তার দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজের জন্য তা অনেক বেশী উপকারী ও গঠনমূলক। কিন্তু বর্তমানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে অনেকেই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে না বা এমন কিছু পড়তে বাধ্য হয় যাতে তার মোটেও আগ্রহ নেই কুরআনের আদর্শ যা বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাকে চিহ্নিত করে ও সমাধান দেয় , সেই আদর্শ মোতাবেক চললে অপর্যাপ্ত শিক্ষা সুবিধার উদ্ভবই ঘটবে না।

কুরআনের জ্ঞানগর্ভ নির্দেশ মেনে চললে মানুষ শিক্ষাসহ জীবনের সব স্তরের সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবে। কেননা , সে সমাজে থাকবে না গরীব ও ধনীর মধ্যে কোন অনিষ্টকর পার্থক্য। কেননা , আগেই উল্লেখ করা হয়েছে-যারা আল্লাহকে ভালবাসে তারা উদ্বৃত্ত সম্পদ গরীবদের দু:খ দুর করতে দান করে দেয়। এসব সম্পদ একসাথে যখন বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যয় হয় , যেমন: শিক্ষা বা জনস্বাস্থ্য খাতে , তখন এসব সমস্যা সমাধানে বেশী সময় লাগে না।

পুরো পৃথিবী জুড়ে এভাবে উদ্বৃত্ত সম্পদ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য যদি দান করা হয় , তাহলে ধনী ও গরীব দেশগুলির মধ্যে যে বৈষম্য রয়েছে , তা ঘুচে যাবে। ধনী দেশগুলি তাদের অতিরিক্ত সম্পদ অনুন্নত দেশগুলিতে দেবে প্রতিদানের আশা না করে। সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং মুসলমানদের জন্য সমস্যা সমাধানে কাজ করা কর্তব্য। কেননা ,তরুণ প্রজন্মকে কুরআনের শিক্ষা দেয়া ও কুরআনের মতাদর্শে জীবন গড়তে নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব মুসলমানদের। এই ধরনের শিক্ষা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সর্ম্পকে মানুষকে আলোকিত করে ও তাদেরকে আল্লাহ'র নিদর্শনাবলী দেখায় এই পৃথিবীতে ও মহাবিশ্বে। এটা না হলে , নতুন প্রজন্ম , এরা ধর্মবিশ্বাসহীন মতাদর্শের শিকার হবে ও দেশ , মানুষ ও ধর্মের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না।

ছোটবেলায় সঠিক শিক্ষা না পেলে বড় হলে মানুষ ধর্মহীন জীবন বেছে নেয় ও ধর্মের কল্যাণ থেকে বচিঞ্চত হয় ও বিপথে চলে যায়। অবশ্যই , একজন মানুষ যে আল্লাহকে ভয় করে ও যে বিবেকসম্পন্ন , সে এমনটি করবে না।

৪। নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতার অভাব:

যে সমাজে ন্যায়-বিচার নেই, নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য সেখানে একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। অনেক দেশেই , মেয়েরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে বিবেচিত হয় , কখনো বা সমাজের বাইরের অনাকাঙ্খিত কেউ হিসাবে তারা নিগৃহীত হয়।দুর্বল , আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে মনে করে অনেক সময়ই নারীদের উপর নানা অত্যাচার চলে।

একই কারণে সমাজে তারা এমন স্থানে আসতে পারে না যেখান থেকে কর্তৃত্ব করা যায় বা অন্যের শ্রদ্ধা অর্জন করা যায়। যে সমাজে এ ধরনের কু-সংস্কার প্রচলিত রয়েছে , সেখানে মেয়েদেরকে সফল ব্যবসায়ী হিসাবে সহজে মেনে নেয়া হয় না। মেয়েদেরকে সাধারণভাবে মনে করা হয় , তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব রয়েছে , সংকল্পের দৃঢ়তা নেই এবং বুদ্ধি কম। মেয়েদের সম্পর্কে এ ধরনের কিছু প্রচলিত ভুল ধারণা সমাজে চালু আছে এবং যখনই কোন মেয়ে কোন ভুল করে ,তখন সেটাকে ঐ ভুল ধারণার সাথে এক করে দোষটাকে ব্যাখ্যা করা হয়।

কিন্তু , সত্যি কথা হলো , কাজে কর্মে ঐ একই ভুল পুরুষদেরও হয়। কোন কাজের জন্য আবেদনকারীদের মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়ে থাকলে সাধারণত পুরুষদেরকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয় ; যদিও হয়তো অন্য মহিলা প্রাথীরও একই দক্ষতা ,যোগ্যতা ও বুদ্ধি রয়েছে।

এসব কারণে , ব্যবসা ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য সুযোগ-সুবিধা খুবই সীমিত। বেশীরভাগ মেয়েকেই এসব প্রচলিত বিরুদ্ধ ধারণার শিকার হতে হয়। প্রচলিত ধ্যাণ-ধারণার কারণে অনেক সমাজে মেয়েদেরকে হীন বা গৌণ ভূমিকা পালন করতে হয়। প্রচলিত

কু-সংস্কারের দরুণ এই লিঙ্গ বৈষম্যের প্রভাব অনুন্নত দেশগুলিতে লক্ষ্য করা যায়।

শিক্ষা ও কাজের ক্ষেত্রে প্রাপ্য সুবিধা ভোগ করার তো প্রশ্নই নেই , মেয়েরা এমন কী নিজেদের বিয়ের ব্যাপারেও কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। মেয়েদের জীবনের যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভুমিকা রাখে পিতা বা স্বামী। এসব সমস্যা দুর করতে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। মাত্র কয়েকটির উল্লেখ এখানে করা হলো: - নারীদের অধিকার রক্ষায় সংস্থা গঠণ করা হয় ; নানা ধরনের মতবাদ চালু করা হয়েছে যেমন: নারী স্বাধীনতা , নারীর সমান অধিকার ইত্যাদি।

এ ধরনের নারীবাদী আন্দোলন অথবা সভা –সেমিনার–ভাষণ ইত্যাদি নারীদের সমস্যা সমাধানে তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না। এ ধরনের প্রচেষ্টা সমস্যাকে বরং আরো জটিল করেছে। এটাই স্বাভাবিক। কেননা , প্রকৃত সমাধান একমাত্র পাক–কুরআনেই রয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহ'র আদর্শ মেনে চলা হয় যে সমাজে , সেখানে কোন ক্ষতিকর সংস্কার বা মতের বশবর্তী হয়ে কারো প্রতি কোন বৈষম্য করা হয় না --সে নারী বা পুরুষ , ধনী , গরীব , তরুণ বা বৃদ্ধ যেই হোক না কেন। সামাজিক অবস্থান , পেশা , সম্পদ , নারী বা পুরুষ ভেদে কেউ নির্দিষ্ট কোন বিশেষ সুবিধা ভোগ করে না। যারা ভাল কাজ করে ও আল্লাহকে ভয় করে চলে , তারা অন্যদের থেকে আলাদা।

এদের সম্পর্কে সুরা বাকারায় বলা হয়েছে , " ...এবং তোমরা পাথেয় সাথে নাও ; তবে সবচেয়ে উত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া। " (২: ১৯৭) ।

পবিত্র কুরআনে নারী ও পুরুষকে পক্ষপাতিত্ব করা হয় নি। যারা সৎ কর্মে নিয়োজিত সেই সব বিশ্বাসী নারী ও পুরুষকে আল্লাহ একই সাথে সম্বোধন করেছেন । আল্লাহ'র নির্দেশিত পথে চলার উপর কুরআনে জোর দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে , নারী ও পুরুষে পার্থক্য করা হয় নি। বিশ্বাসী নারী , পুরুষকে যে সমস্ত আয়াতে আল্লাহ'র আদেশ মেনে চলতে বলা হয়েছে , সেগুলি হলো: –" মুমিন নর ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু। তারা ভাল কাজের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে , সালাত কায়েম করে , যাকাত দেয় ও আনুগত্য করে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের। এদেরই উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল প্রতাপশালী , হেকমতওয়ালা। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুমিন নর ও মুমিন নারীকে জান্নাতের , প্রবাহিত হয় যার তলদেশে নহরসমূহ , সেথায় তারা অনন্তকাল থাকবে ও চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকবে উত্তম বাসস্থান। আল্লাহ সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। এটাই মহা সাফল্য "

(সুরা তওবা ; ৯: ৭১–৭২)।

" নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী , মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী ,অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী , সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী , ধৈর্য্যশীল পুরুষ ও ধৈর্য্যশীল নারী , বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী ,দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী , সওম পালনকারী পুরুষ ও সওম পালনকারী নারী , নিজ লজ্জাস্থান হেফাজতকারী পুরুষ ও নিজ লজ্জাস্থান হেফাজতকারী নারী এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী ---এদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান" (সুরা আহ্যাব ; ৩৩:৩৫) ।

“ যে ব্যক্তি ভাল কাজ করবে , হোক্ সে পুরুষ কিংবা নারী এবং সে ঈমানদার হবে -- এরুপ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে , আর তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না” (সুরা নিসা ; ৪: ১২৪)।

সামাজিক জীবনে মেয়েরা যে সব সমস্যার মুখোমুখি হয়:-

যে সমাজ ধর্ম থেকে দুরে থাকে , সেখানে নারীদেরকে অনেক সমস্যার মুখোমুখী হতে হয়; বিশেষ করে ,তালাকপ্রাপ্তা মেয়েদের সমস্যা গুরুত্ব সহকারে উল্লেখের দাবী রাখে। বিয়ের পর সাধারণত মেয়েরা চাকরী বা অন্য কিছু করতে চাইলে স্বামী বাধা দেয়; ফলে মেয়েরা অর্থনৈতিকভাবে স্বামীর উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তালাকের ঘটনার পর দেখা যায় যে , এসব মেয়েদের বেশীরভাগই কোন পেশার সাথে জড়িত নয় ; তাছাড়া , চাকরী করার মত বয়সও অনেকেরই নেই ; নানা সামাজিক সুযোগ-সুবিধার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে এসব তালাকপ্রাপ্তা মেয়েদের জীবন অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক সময় , বিচ্ছেদের সময় স্বামী ও স্ত্রী উভয় পক্ষই চেষ্টা করে কিভাবে নিজের পক্ষে সুযোগ-সুবিধা বেশী আদায় করা যায় ; ফলে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে পড়ে।

কুরআন ও সুন্নাহ’র আদর্শে গড়া বিশ্বাসীদের সমাজে মানুষের এ ধরনের সমস্যা হয় না। বিয়ের সময়কার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বিবাহ বিচ্ছেদের সময়ও পুরোপুরি হারিয়ে যায় না ; কেননা , পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমেই তা ঘটে থাকে। একে অন্যকে শুধু নারী বা পুরুষ হিসাবে দেখা হয় না । এই মানসিকতাই তাদের মধ্যে কাজ করে যে , অন্য পক্ষ “ মানুষ ” , আল্লাহতে বিশ্বাসী ও আল্লাহ’র সৃষ্টির মধ্যে সেরা।

এই মন-মানসিকতা তালাকের পরও সৌজন্য ও ভদ্র আচরণের সহায়ক হয়। বিয়ে - বিচ্ছেদের পর মেয়েদের অধিকার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তালাকপ্রাপ্তা একজন মেয়ের কল্যাণ তার অর্থনৈতিক দিকের কথা বিবেচনা করা হয়েছে নীচের আয়াতগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে , একজন নারী বিচ্ছেদের সময়কাল ও পরে কী ধরনের অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করবে।

“ আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য বিধিমত ভরণপোষণ দেয়া মোত্তাকীদের উপর কর্তব্য

(সুরা বাকারা; ২: ২৪১)।

..." তোমরা তাদের কিছু খরচ দেবে , ধনী তার সাধ্যমত দেবে এবং গরীব তার সাধ্য অনুযায়ী দিবে। বিধিমত খরচ দেয়া সৎ কর্মশীলদের উপর কর্তব্য । আর যদি তোমরা তাদের মোহর ধার্য করার পর স্পর্শ করার পুর্বে তালাক দাও , তবে যে মোহর তোমরা ঠিক করেছো , তার অর্ধেক দিতে হবে। অবশ্য যদি স্ত্রীরা ক্ষমা করে দেয় অথবা যার হাতে বিয়ের বন্ধন রয়েছে সে যদি ক্ষমা করে দেয় তবে তা স্বতন্ত্র কথা। আর তোমরা যদি ক্ষমা করে দাও তবে তা হবে তাকওয়ার নিকটতর। তোমরা নিজেদের মধ্যে সহানুভূতির কথা ভুলে যেও না। তোমরা যা করো নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সব খুব ভালভাবেই দেখেন (সুরা বাকারা; ২: ২৩৬-২৩৭) ।

" ধনী ব্যক্তি তার সাধ্য অনুযায়ী খরচ করবে ; আর যাকে সীমিত রিযিক দেয়া হয়েছে, সে আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন , তা থেকে খরচ করবে। আল্লাহ যাকে যা দিয়েছেন , তার চেয়ে বেশী খরচ করার আদেশ তিনি দেন না। কষ্টের পর আল্লাহ অবশ্যই স্বস্তি দেবেন " (সুরা তালাক; ৬৫: ৭)। আবারো এই আয়াত থেকে আমরা শিক্ষা নেই , কোন পুরুষের পক্ষে এটা বৈধ নয় যে সে বিয়ের সময় স্ত্রীকে যা দিয়েছিল , তা আবার ফেরত নেবে। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য ইদ্দতকালীন সময়ে বাসস্থানের ব্যবস্থা স্বামীকে করতে হবে। কুরআনের নীতি অনুযায়ী , কোন মেয়েকে জোর করে নিজ অধীনে রাখা যাবে না। এভাবে কুরআনে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বাতলে দেয়া হয়েছে। তাই যে সমাজে মানুষরা কুরআনের আদর্শ মেনে চলে , সেখানে মেয়েরা নির্যাতনের শিকার হয় না বা অসম্মানের পাত্রী হয় না--যেমনটি মেয়েরা হয় অন্য সমাজে।

৫। সম্পদের সমান বরাদ্দ:

বর্তমানে পৃথিবীতে সম্পদের উপর সব মানুষের সমান অধিকার নেই। একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের রোজ ২,৮০০ ক্যালোরী প্রয়োজন। এই পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষের পুষ্টির চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট সম্পদ রয়েছে। তবুও , এর সুফল থেকে পৃথিবীর অনেকেই বঞ্চিত ও ৮০০ মিলিয়ন মানুষ ভয়াবহ অপুষ্টির শিকার।

বিশ্বের জনসংখ্যার ৭৫% (১৯৯১ সালে ৪.০৩ বিলিয়ন মানুষ) ন্যূনতম ক্যালোরী গ্রহণের সীমারেখার অনেক নীচে ছিল। অপুষ্টির শিকার জনসংখ্যার হার একেক দেশে একেক রকম। এটা নির্ভর করে বিশ্বব্যাপী খাদ্য বন্টনে অসাম্যের পরিমাণের উপর।

আরেকটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় , উন্নয়নশীল দেশগুলির মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহ (যেমন , খাদ্য পানি , স্যানিটেশন , স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষা খাতে) প্রয়োজন বছরে আনুমানিক ৪০ মিলিয়ন ডলার। এটি বিশ্বের সবচেয়ে ধনী

২২৫জন মানুষের সম্মিলিত বাজেটের ৪% (সূত্রঃ *UNESCO the COURIER*, March 1999, p.22)

এই পরিসংখ্যানে এটাও নির্দেশ করে যে , কিছু দেশের অতিরিক্ত সম্পদে অন্যদের কোন প্রবেশাধিকার নেই যদিও তাদের প্রয়োজনগুলি অত্যন্ত জরুরী। ধনী দেশগুলিতে কিছু সম্পদ কোন কাজে লাগে না , অলস পড়ে থাকে যা গরীব দেশগুলিতে স্থানান্তর করা যেত।

আফ্রিকার কিছু দেশের দুর্দশাকে আমরা উদাহরণ হিসাব দিতে পারি যা সবারই জানা। বিশ্বের অসাম্য নীতি শুধুমাত্র খাবার ও পানিতে সীমাবদ্ধ নেই। এই অসমতা স্বাস্থ্য সেবাতেও প্রযোজ্য ও এটি বিশ্ব জুড়ে মারাত্মক সব সমস্যার সৃষ্টি করছে।

ধন্যবাদ চিকিৎসা বিজ্ঞান , বিভিন্ন গবেষণা ও আবিষ্কারকে -----যার দরুন অনেক অসুখই এখন অতি সহজে ভাল হয় এবং অনেক অসুখকে প্রতিরোধ করাও সম্ভব । ধনী দেশগুলিতে চিকিৎসা প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক সহায়তায় এটি সম্ভব। কিন্তু , অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য এই একই তথ্য প্রযোজ্য নয়। সামান্য যে স্বাস্থ্য সমস্য ধনী দেশগুলি অতি সহজেই মোকাবেলা করে , তা গরীব দেশগুলিতে এক গুরুতর হুমকি। যেমন , কুষ্ঠ রোগ। এটি একটি ক্ষতিকর জীবানুবাহী অসুখ যা মুলতঃ বিশ্বের দারিদ্র পীড়িত এলাকাগুলিতে বেশী হয়। কুষ্ঠ রোগ স্মরণাতীত সময়কাল থেকে মানুষকে পীড়িত করেছে। এখন এই রোগের চিকিৎসা তুলনামুলকভাবে সহজ। যদিও অত্যন্ত গরীব দেশগুলির জন্য কুষ্ঠরোগ মারাত্মক হুমকি। উন্নত দেশে কুষ্ঠ রোগের কথা খুব একটা শোনা যায় না বা কালেভদ্রে হয়তো ২/১জন কুষ্ঠ রোগীর সন্ধান মেলে। এই রোগের চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদী ও ব্যয়বহুল। এসব কারণে , গরীব দেশগুলিতে কুষ্ঠ রোগ নির্মুল করা যাচ্ছে না। বাস্তবতা এই যে , ধনী দেশগুলির চিকিৎসা সহায়তা পেলে গরীব দেশগুলি এই সমস্যার হাত থেকে রক্ষা পেত।

সব ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যাকে বিবেচনায় নিলে কুষ্ঠ রোগের সমস্যাকে বলা যায় বিশাল বরফখন্ডের একটি ক্ষুদ্র কণা। অনুন্নত দেশগুলিতে যে চিকিৎসা প্রযুক্তি রয়েছে , সেসব মহামারীর মোকাবেলায় সক্ষম নয়। এছাড়া , অর্থের অভাবে এসব রোগের চিকিৎসার ব্যাবস্থা করাই সম্ভব হয় না -----রোগ নির্মুলের তো কোন প্রশ্নই আসতে পারে

না। যদিও , সব ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান বেশ সহজ। ধনী দেশগুলির গুদামঘরে স্তুপ হয়ে পড়ে থাকা চিকিৎসার যন্ত্রপাতিগুলিকে অনুন্নত দেশগুলিতে পাঠিয়ে দেয়া যায়। পুরো পৃথিবীতে বৈষম্যের যে ছড়াছড়ি , তা লক্ষ্য করা যায় তথ্য প্রযুক্তিতেও । কৃষিক্ষেত্রের সম্প্রসারণের জন্য উন্নত দেশগুলি কৃষি ও সেচ প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণায় প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করে।

অনুর্বর ভুমিতে এমন কী , মরুর বুকেও এখন ফসল ফলানো সম্ভব। সেচ ব্যবস্থার এই রুপান্তর সম্ভব হয়েছে তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে। সেচ পদ্ধতিতে এখন কম্পিউটার প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে পানির অপচয় সর্বনিম্নে রাখা; মাটির নীচ দিয়ে গাছের গোড়ায় সরাসরি পানি প্রবাহিত করা; পানির প্রতিটি ফোঁটা যেন কৃষির কল্যাণে আসে ; তা নিশ্চিত করা। পানি সম্পদকে পরিশোধিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন , সমুদ্রের পানি ও বন্যার পানিকে মরুভূমিকে উর্বর করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এক আধুনিক কৃষি পদ্ধতির সাহায্যে মরুভূমিতে উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। এসবই ভাল খবর। তবে , এসব প্রযুক্তিতে গরীব দেশগুলির প্রবেশাধিকার নেই বা এসব আবিষ্কারের সুফল গরীব দেশগুলি পাচ্ছে না। এটা একটা সমস্যা যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। এসব গরীব দেশে অনুন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে এমন কী উর্বর জমিতেও বেশী উৎপাদন করা যায় না। ফলে , ক্ষুধা এসব দেশের মানুষের জন্য এক বিরাট হুমকী।

কোন কোন ক্ষেত্রে একটি দেশের সব মানুষই ক্ষুধার হুমকীর মুখে থাকে। সংবাদপত্র পাতার পর পাতা বরাদ্দ করে এই মানবিক বিপর্যয়ের কাহিনী মানুষকে জানায় ; তবে মানুষের বিবেক জাগ্রত করে সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়।

ক্ষণস্থায়ী কিছু সমাধানের ব্যবস্থা হয় এবং স্বল্পমেয়াদী কিছু প্রকল্প সমাধানের জন্য গ্রহণ করা হয় ; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি বর্জিত এসব অক্ষম প্রচেষ্টা কোন সাফল্য বয়ে আসে না। মানুষের দরকার দ্রুত ও কার্যকরী সমাধান যা সত্যিকারের প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করবে।আজকাল অত্যন্ত গরীব দেশগুলি বড় আকারের খাদ্য সাহায্য পায় । এরপরও , এই সাহায্য তাদের সত্যিকারের কল্যাণে আসে না ; কেননা এগুলি করা হয় প্রদর্শণীর জন্য এবং দুর্ভিক্ষে আক্রান্তদের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এছাড়া , সংস্থার ভিতরের অব্যাবস্থাপনা ও বাধা এবং দেরীতে পাঠানোর জন্য খাবার অনেক সময়ই গন্তব্যে পোঁছার আগে নষ্ট হয়ে যায়।

এসব সাহায্য পাঠানোর জন্য বিভিন্ন সংস্থা উদ্যোগ নেয় ; যদিও এসব সংস্থার বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব রয়েছে ; কেননা , এরা অনেক সময়ই দুর্নীতিতে নিমজ্জিত

থাকে। সাহায্যের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলির মধ্যে আছে অহ:বোধ , কায়েমী স্বার্থ , উচ্চাকাঙ্খা , যত্নের অভাব এবং এ ধরনের আরো নৈতিক ত্রুটি। এই নীতিহীনতার অবসান ঘটানো সম্ভব কুরআনকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে এবং তাদেরকে এটা মনে করিয়ে দিয়ে যে আমরা এই দুনিয়ায় যা করছি তার জন্য মৃত্যুর পরে দায়ী থাকবো।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে বিশ্বে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতের মতো আরো অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব। একটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে যে : যখন আমরা বলি সম্পদের সুষ্ঠু বা নিরপেক্ষ সরবাহ , তখন এটা যেন কেউ মনে না করে যে , বিশ্বের সব জায়গার সব মানুষ সব জিনিষ একই পরিমাণে পাবে। এই দাবীর অর্থ মানুষের প্রয়োজন যেন সম্পূর্ণভাবে মেটে । মরুভূমিতে বিশেষভাবে জলসেচের ব্যবস্থা করলে তা অন্য জায়গার মানুষের প্রয়োজনে আসবে না। যে দেশের নিজের জনগণের জন্যই ঔষধের প্রচুর চাহিদা রয়েছে , তারা অন্য দেশের মানুষের জন্য ঔষধ পাঠাবে --এটাও কারো আশা করা ঠিক হবে না।

এছাড়া , এটাও অপরিহার্য নয় যে , প্রত্যেক নাগরিকের অধিকারে একই পরিমাণ সম্পদ থাকবে। তবে এমনটি যেন না হয় , কিছু মানুষ সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলে ইচ্ছামত অপব্যয় করছে আর তার পাশেই অসংখ্য মানুষ চরম অভাবে রয়েছে।

আল্লাহ বলেছেন , "...তারা তোমাকে প্রশ্ন করে , কী তারা খরচ করবে ? বল: প্রয়োজন পূরণের পর যা বাঁচে তা...." (সুরা বাকারা ; ২: ২১৯)। যখন আল্লাহ'র এই নির্দেশ আমরা মেনে চলবো , তখন সম্পদের সুষ্ঠু বিতরণ সমাজকে স্বত:স্ফূর্তভাবে শান্তির পথে নিয়ে যাবে।

শান্তি: ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে শান্তি তার স্বাভাবিক পরিণাম

একমাত্র কুরআনের আদর্শে জীবন গড়লে একটি সুষ্ঠু , পরিপূর্ণ সামাজিক কাঠামো গঠণ করা সম্ভব। কারণ , একমাত্র কুরআনের আদর্শ মানুষকে উত্তম নৈতিকতা ও জ্ঞান দান করে। স্বার্থপর , অহংকারী , বিবেচনাহীন মানুষেরা বদলে গিয়ে হবে ক্ষমাশীল , ন্যায়পরায়ন যে অন্যের কল্যাণের কথা চিন্তা করে এবং সেজন্য সমাধানের ব্যবস্থা করে। এ কারণে , অনেক সমস্যার অবসান ঘটে।

যে সমাজে সুবিচার রয়েছে , সেখানে মানুষ নৈতিকতার অধ:পতনে গিয়ে প্রতারণা , অন্যের অধিকার হরণ ইত্যাদি অনৈতিক কাজ করে না। কুরআনের মৌলিক শিক্ষা হলো --পারস্পরিক সহযোগিতা ও ক্ষমা যা একটি আদর্শ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠণের

সহায়ক । এমন সমাজে একে অন্যের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট থাকে ; ফলে সবার স্বার্থ ও অধিকার নিশ্চিত হয় , এটা সমাজে সামগ্রিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এটা সব বিশ্বাসীর কর্তব্য , আল্লাহ যে সব নীতি ও মূল্যবোধের প্রশংসা করেছেন ও যে আদর্শভিত্তিক ধর্মের কথা বলেছেন ,তা পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। এটা বিশ্বাসীদের অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ বৈশিষ্ট্য ..." আর তোমাদের মধ্যে এমন এক দল থাকা দরকার যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে ও আদেশ করবে ভাল কাজের আর নিষেধ করবে মন্দ কাজে। এরাই হলো সফলকাম "

(সুরা আলে – 'ইমরান; ৩: ১০৪) ।

" তারা তওবাকারী , ইবাদতকারী , আল্লাহ'র প্রশংসাকারী ,সওম পালনকারী , রুকুকারী , সিজদাকারী , ভাল কাজের আদেশদাতা , মন্দ কাজে বাধা প্রদানকারী এবং আল্লাহ'র নির্ধারিত সীমারেখার হেফাজতকারী ;(এসব গুণে গুণান্বিত) মুমিনদেরকে তুমি সুখবর শুনিয়ে দাও " (সুরা তওবা; ৯: ১১২)।

যার এই আদর্শে বাস করে আল্লাহ তাদের কথা কুরআনে উল্লেখ করেছেন । যারা খারাপ সব কাজ থেকে দুরে থাকে , পরকালে তারাই মুক্তি পাবে –" তারপর যখন তারা ভুলে গেল সেসব উপদেশ যা তাদের দেয়া হয়েছিল , তখন আমি রক্ষা করলাম তাদেরকে যারা মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্ত করতো এবং যারা সীমা লংঘন করতো কঠোর আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করলাম তাদেরকে , কেননা তারা নাফরমানী করতো" (সুরা আরাফ; ৭: ১৬৫)।

রাজনীতির চিত্র:

" আর যখন নেতৃত্ব লাভ করে , তখন সে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে এবং শস্যক্ষেত ও প্রাণনাশ করতে প্রয়াস পায় ; আল্লাহ বিপর্যয় পছন্দ করেন না। " (সুরা বাকারা ; ২: ২০৫)

ন্যায়বিচার , নৈতিকতা ও সততার মধ্যে একজন তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাটাবে ––– এমনটিই হওয়া উচিৎ। বর্তমানে আমরা অনেকেই সংসদীয় গণতন্ত্রে বাস করি। এই জীবন আদর্শ রাজনীতিবিদদের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

অনেক মানুষের কাছে একজন রাজনীতিবিদ দায়বদ্ধ থাকেন। অনেক মানুষ তার কাছে সমস্যার সমাধানের জন্য আসে। এজন্য , এটা খুবই জরুরী যে একজন রাজনৈতিক নেতা নিরপেক্ষ থাকবেন। কারো বিরুদ্ধে পূর্ব ধারণা বা সংস্কারের বশে কোন ধরনের বৈষম্য করবেন না; মানুষের প্রয়োজন কী তা যথাযথভাবে নির্ধারণ করে সেভাবে কাজের পরিকল্পনা করতে হবে।

জনস্বার্থে কাজ করার সময় নেতাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে বিশেষজ্ঞ , তার সাথে সহযোগিতা করতে হবে। যে যোগ্যতার সাথে কাজ করতে পারবে , তাকেই দায়িত্ব দিতে হবে। একটি কাজ কেন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে , সেই কারণ খুঁজে বের করতে পারলে , একজন রাজনীতিবিদ প্রয়োজনে তার কর্মকৌশলে পরিবর্তন ঘটিয়ে সমস্যার দ্রুত সমাধানও বের করতে সক্ষম হবেন---এমনটি আশা করা যায়। জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে একজন রাজনীতিবিদকে কোন কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হবে , তা বুঝতে হবে।

অনেকের জন্যই রাজনীতির উদ্দেশ্য জনসেবা নয় বরং এটি একটি লাভজনক বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে। এটা এই অর্থে যে , সেই রাজনীতিবিদকেই সফল বলা হয় যে কোন ক্ষমতা লাভ করে , সুদৃঢ়ভাবে নিজেকে সেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখতে পারে এবং যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ক্ষমতাকে সুরক্ষিত রাখে। শুধু তাই নয় , সম্ভব হলে তার ক্ষমতা সে বৃদ্ধিও করে। রাজনীতিতে এটাই যখন স্বাভাবিক রীতি হয়ে যায় , তখন এত আর অবাক হওয়ার কিছু নেই যে , দুর্নীতি ও প্রতারণা তখন নিয়মে পরিণত হবে। সব জায়গাতেই , কী পূর্বে বা পশ্চিমে , উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এটাই বাস্তব যে , বাণিজ্যের সাথে রাজনীতি একাকার হয়ে গিয়েছে।

তাই এটা মোটেও অস্বাভাবিক নয় যে , ক্ষমতাসীন নেতারা ব্যক্তিস্বার্থে রাজনীতিকে অপব্যবহার করছে , কোন কেলেংকারীতে জড়িয়েই রাজনৈতিক জীবনকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে অথবা ক্ষমতা থেকে বাধ্য হয়ে সরে দাড়াচ্ছে।

অনেক শাসন ব্যবস্থায় , নেতারা অত্যন্ত বিলাসী জীবন যাপন করে , যখন তাদের দেশের মানুষ না খেয়ে থাকে ও মহামারীতে ভুগে। মবুতু , জায়েরের ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রপতি এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । যখন সে দেশের মানুষ এক টুকরো রুটির জন্য মারামারি করতো , তখন প্রতি মাসে মবুতুর ব্যক্তিগত বিমান ফ্রান্সে যেত তার কেশ বিন্যাসকারীকে আনার জন্য। মবুতু সম্পদের পাহাড় গড়েছিল। সে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও হীরার খনিগুলিকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করতো। সে পশ্চিমা দেশগুলিকে এসব সম্পদ থেকে সুবিধা ভোগ করতে দিতো যখন তার নিজের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ

হচ্ছিলো ও জাতিগত দাঙ্গায় দেশে শান্তি ছিল না। এ ধরনের অবস্থা যাতে প্রতিরোধ করা যায় , তার একমাত্র উপায় হলো কুরআনের শাসন ।

ধর্মহীন শাসনব্যবস্থায় মানুষ নিজ নিজ স্বার্থে কাজ করে ও তাদের লোভের কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না। কেননা, সুবিচার , ক্ষমতা , ভালবাসা , শ্রদ্ধা ও সততা ---এসব মূল্যবোধে তারা বিশ্বাসী হয় না। এ ধরনের মানুষ সমাজের জন্য যে বিভিন্ন ধরনের হুমকী সৃষ্টি করে , সে সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ বলেছেন " আর যখন নেতৃত্ব লাভ করে , তখন সে যমীনে বিপর্যয় সৃস্টি করতে চেষ্টা করে এবং শস্যক্ষেত ও প্রাণনাশ করতে প্রয়াস পায় ; আল্লাহ বিপর্যয় পছন্দ করেন না। "
(সুরা বাকারা ; ২: ২০৫)।

উপরে উল্লেখিত মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে কোন রকম পরিবর্তনের আশা করা অর্থহীন , যতক্ষণ না মানুষ স্রষ্টার আসমানী কিতাবের নীতি মেনে না চলবে। যে দেশের মানুষ আল্লাহকে ভয় পায় ও যেখানে বিবেকের শাসন রয়েছে , অবিচার ও ক্ষমতার অপব্যবহারের কোন সুযোগ সেখানে নেই। মানুষের সমস্যা নিয়ে সেখানে সঠিকভাবে পর্যালোচনা করা হয় ও দক্ষতার সাথে সমস্যার সমাধান করা হয়। জনসেবার পুরষ্কার হিসাবে বিবেচনা করা হয় কেবলমাত্র আল্লাহ'র সন্তুষ্টি। মানুষকে সাহায্য করা হয় এই জন্য যে , এর উত্তম প্রতিদান এ জগতে নয় বরং মৃত্যু পরবর্তী জীবনে আল্লাহ'র কাছ থেকে পাওয়া যাবে।

সেই অতীতকাল থেকে আল্লাহ ঐশী বাণী নবী ও রাসুলদের (দ:) মাধ্যমে মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন। আল্লাহর নবীরা (দ:) মানুষকে সত্যের পথে দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু , মানুষরা এইসব নবীদেরকে অবিশ্বাস করেছে ও কখনো সন্দেহ করেছে যে , এসব আন্তরিক চেষ্টার পিছনে তাঁদের কোন গোপন উদ্দেশ্য আছে। সেসব অবিশ্বাসীদের প্রতি নবীদের (দ:) জন্য উত্তর ছিল একই - " বল: আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না ও যারা মিথ্যা দাবী করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই " (সুরা সাদ; ৩৮ : ৮৬) । " হে আমার সম্প্রদায়; আমি এর বদলে তোমাদের কাছে পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক আছে তাঁরই কাছে , যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন ; তোমরা কি তবুও বুঝবে না ? " (সুরা হুদ ; ১১: ৫১)

আল্লাহতে যার বিশ্বাস আছে , তারা সে সব উদাহরণ অনুসরণ করে , যার প্রশংসা কুরআনে করা হয়েছে। তারা তাদের সেবা ও সাহায্যের বিনিময়ে এই দুনিয়ায় কোন

লাভের আশা করে না। অবিশ্বাসীদের সমাজের রাজনৈতিক জীবনে সব ধরনের রাজনৈতিক ইস্যু যেমন আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক , ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থ সব একসূত্রে গাঁথা।

এই যখন অবস্থা , তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই অশুভ শক্তির কাছে মানুষ ও দেশের স্বার্থ রাজনীতিতে উপেক্ষিত হয়। বিশেষ দলের স্বার্থে বিভিন্ন দুর্নীতিকে উপেক্ষা করা হয়। মার্কিন রাজনীতিতে লবীর ভূমিকা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নির্বাচনের সময় প্রার্থীদের প্রচারের জন্য অঘোষিত প্রচুর টাকা বিনিয়োগ করা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো সিনেটে বা আইনসভায় এমন কারো জন্য আসন নিশ্চিত করা --যে বা যারা সেখানে থেকে বিশেষ দলের স্বার্থ রক্ষা করবে।

Economist জানিয়েছে , ১৯৯২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনী প্রচারের পিছনে তিন বিলিয়ন ডলার খরচ করা হয় (টীকা ৪: দি ইকনোমিস্ট , ৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭) । অবৈধভাবে টাকা বিনিয়োগ করে লবিস্ট দলগুলি এতটাই শক্তিশালী হয় যে , অন্য দেশের সরকারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী করার মতো ক্ষমতাও তারা অর্জন করে। এসব ক্ষেত্রে আইনসভায় সদস্যদের উপর লবিকারী প্রভাব বিস্তার করে। যারা প্রচুর চাঁদা দেয় , এমন সহায়তাকারীদের চটানোর সাহস রাজনীতিবিদদের নেই। তাই তারা বিশেষ গোষ্ঠি দ্বারা নির্দেশিত হয়ে আইনসভায় বসে এমন সব নীতি প্রণয়ন করে , যা সেই বিশেষ দলের স্বার্থ রক্ষা করে। প্রয়োজনে কোন কৃত্রিম সংকটও সৃষ্টি করা হয়।

কখনো কখনো দলের ভিতরে নানা ধরনের মত-বিরোধ ও সংঘর্ষ ঘটে। কখনো এমন কী চক্রান্ত করে পুরো দেশে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়; যাতে বিশেষ গোষ্ঠি ফায়দা লুটতে পারে। যারা ক্ষমতায় আছে ও যারা নির্বাচনে তাদের পৃষ্ঠপোষক ছিল , এই দুই দলের মধ্যে গভীর সম্পর্ক একটি দেশকে নিয়ে যায় গভীর সংকটে। এর একটি উদাহরণ হলো ল্যাটিন আমেরিকার স্বৈরতন্ত্র। গত পাঁচ / ছয় শতাব্দী ধরে ল্যাটিন আমেরিকায় ফ্যাসিস্ট নেতারা সীমাহীন প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন কাটিয়েছে ; অন্যদিকে সাধারণ মানষরা চরম দারিদ্র সীমার নীচে অতি কষ্টে বেঁচে ছিল। এখনো পর্যন্ত , ক্ষমতা ক্রমাগত স্বৈরশাসক থেকে সেনানায়ক আবার সেনানায়ক থেকে স্বৈশাসকের মধ্যে হাত বদল হয়। সামরিক শাসকেরা বজ্রমুষ্টিতে শাসন ক্ষমতা জনতার উপর প্রয়োগ করে।

এসব দেশের মধ্য দিয়ে নিয়মিত ড্রাগ পাচার হয়। ড্রাগ ব্যবসায়ী ও ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্বে দেশের উন্নতি ও স্থিতিশীলতা নষ্ট নয়। তবে , স্বার্থান্বেষী

গোষ্ঠি বিকশিত হয় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়েই। নানারকম প্রভাব খাটিয়ে , হুমকি দিয়ে তারা তাদের স্বার্থ বজায় রাখে। সেজন্য নিষ্ঠুরতা , সংঘর্ষ ও গৃহযুদ্ধ হয়ে পড়ে অন্তহীন। কলম্বিয়াতে শুধুমাত্র ১৯৯২ সালে ২৮ হাজার মানুষ খুন হয়। এতেই বোঝা যায় , কেমন বর্বরতা ঘটেছে সেখানে। আমরা দেখি যে , কুরআন ও সুন্নাহ'র আদর্শে না চলার জন্য শাসকশ্রেণী এসব সন্ত্রাসের প্রতি চোখ বন্ধ রাখে। রাজনীতির আরেকটি লক্ষ্যণীয় দিক হলো , ক্ষমতা ও নেতৃত্ব তারাই পায় যারা এর যোগ্য নয়। অবিশ্বাসীদের নিয়ম-নীতি এরকমই। ক্ষমতায় যেতে বা কোন বিশেষ পদ পেতে হলে বিশেষ কোন যোগ্যতার অধিকারী হওয়া জরুরী কিছু নয়।

এসব বিষয়ে জনস্বার্থ অপেক্ষা কায়েমী স্বার্থ মূল চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে। পবিত্র কুরআনে অবশ্য আল্লাহ এর বিপরীত নির্দেশই দিয়েছেন--" নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে , তোমরা আমানত তাদের প্রাপককে দিয়ে দাও। আর তোমরা যখন লোকদের বিচার করবে তখন ন্যায় বিচার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে কতই না উত্তম উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহান শ্রোতা ও মহান দর্শক"(সুরা নিসা; ৪: ৫৮)। এমন একটি সমাজ যেখানে মানুষ কুরআনের আদর্শে চলে না , সেখানে দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী মানুষ দায়িত্ব পায় না। সাধারণত , ক্ষমতাসীনদের আত্মীয়স্বজন , বন্ধুবান্ধবদের মধ্য থেকে কেউ গুরুত্বপূর্ণ পদগুলির অধিকারী হয়।
রাজনীতিবিদ ও বিভিন্ন দলগুলি একই মতাদর্শের হওয়ায় কায়েমী স্বার্থ ও রাজনৈতিক বিবেচনা অগ্রাধিকার পায়। নির্বাচনী প্রচারের সময় ভোটারদের উদ্দেশ্যে বলা ভাল ভাল প্রতিশ্রুতি সব আসলে নিতান্তই কথার কথা। এসব কারণে , জনসেবামূলক কাজগুলি যদি কিছু করা হয় , সেগুলি অনুন্নত কোন গ্রামে বা শহরে না হয়ে সেই এলাকায় হয় যেখানে প্রার্থীর সমর্থক ভোটার বেশী।

এসব বিকৃত সমঝোতা ও অনৈতিকতার জন্য অবিশ্বাস দায়ী। যে মানুষ আল্লাহকে ভয় পায় না , সে নিজের বিবেক অনুযায়ী দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে না। তারা মানুষের প্রতি ক্ষমা ও দয়া দেখায় না এবং ন্যায় আচরণ করে না। তারা হাবভাবে মনে হয় , এই পৃথিবীতে তারা যা করছে সে সবের জন্য কেয়ামতের দিন তাদেরকে যে দায়বদ্ধ হতে হবে , এই বোধটুকু তাদের নেই ; তারা সব ধরনের খারাপ কাজ ও অনৈতিক আচরণ তাই করে থাকে।

এই বিপর্যয়কর অবস্থা দুর করে সুন্দর ভবিষ্যত গড়ার দায়িত্ব যাদের উপর রয়েছে , তাদের কর্তব্য হলো কুরআনের আদর্শ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। সব বিশ্বাসীদের দায়িত্ব হলো -- নৈতিক মুল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আল্লাহ'র আদেশ সম্পর্কে মানুষকে

জানানো ; তাঁদেরকে কুরআনের আলোয় পথ চলতে উদ্বুদ্ধ করা ও খারাপ পথ থেকে দুরে থাকার জন্য সতর্ক করা। যারা এই দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে বা এই কাজ পরে করবে বলে ভাবে , তাঁদের ভয় করা উচিৎ যে , মানুষের দু:খ –কষ্টের প্রতি এরকম নির্বিকার থাকার জন্য কেয়ামতের দিন দায়ী হতে হবে।

অর্থনীতিতে ধর্মহীনতার প্রভাব:

আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন ও দান খয়রাতকে বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে পছন্দ করেন না (সুরা বাকারা ; ২: ২৭৬)।

রোজকার জীবনে আমরা টাকা–পয়সা বা অর্থ সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই বেশী কথা বলি। ধনী ও গরীব সব দেশেই খুব কম মানুষই নিজেদেরকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছে। এই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই চরম অর্থকষ্টে দিন কাটায়। কোনরকম খেয়ে–না খেয়ে তাদের দিন কাটে। অনেক দেশকে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিদেশী সাহায্যের উপর পুরোপুরি নির্ভর করতে হয়।

যদিও বিদেশী ‘‘ সাহায্য ’’ তাদের সমস্যা আরো বাড়িয়ে দেয়। কেননা , ঋণ শোধ তো দুরের কথা , সুদ মেটানোর ক্ষমতাও এই সব গরীব দেশের থাকে না বলে এদেরকে প্রচন্ড দুর্ভোগ পোহাতে হয়। স্বাস্থ্য থেকে শিক্ষা , সব কিছুই অর্থকে কেন্দ্র করে গতিশীল থাকে। উন্নত দেশ হোক্ বা না হোক্ , অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মানুষকে কঠিনভাবে আঘাত করছে। সম্পদ , অপরিমিত ব্যয় এবং তার পরিণামের পাশেই অবস্থান হলো অবনতি ও নি:স্ব করা। চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে মানুষ একে অন্যের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সচেতনতা সৃষ্টি ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী , বহু সেমিনার , অসংখ্য গবেষণা কর্ম ও প্রতিবেদন তৈরী ইত্যাদি বৃথাই করা হয়েছে। বাস্তব সত্য এই যে , প্রতিদিনই পৃথিবীতে দু:খ–কষ্ট–দুর্ভোগ বাড়ছে।

বেকারত্ব বিশ্বব্যাপী এক সমস্যা । এমন কী , যাদের চাকরী আছে , তাদের বেতনও এমন পর্যাপ্ত নয় যে , উত্তম জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করবে। তাই কিছু ভাল বেতনের একটি সরকারী পদের জন্য শত শত প্রার্থী দরখাস্ত করে। কাজ পাওয়ার সামান্য সম্ভাবনা থাকলেই কর্মসংস্থান অফিসের সামনে মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা লাইন ধরে দাড়িয়ে থাকে। তাহলে সমাধান কোথায় ? এসব সমস্যা সমাধানে উদ্যোগে ব্যর্থ হচ্ছে ?

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য অর্থনৈতিক উন্নতি , উৎপাদনশীলতা , কাজের সুগোগ বৃদ্ধি ও দক্ষ জনশক্তি অপরিহার্য। এরপরও , পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে , বিশ্বে কমপক্ষে ৮২০ মিলিয়ন বেকার মানুষ রয়েছে। এদের উপর নির্ভরশীলদের সংখ্যা যখন আমরা হিসাব করি , তখন এর নানামুখী দিক বিচারে সমস্যার ভয়াবহতা আরো বেশী বোঝা যায়। আমাদের এখনকার সময়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশেষ করে অনুন্নত দেশে ব্যাংকের সুদের উপর নির্ভরশীল।

আমানতকারীদেরকে ব্যাংক যে উচ্চ হারে সুদ দেয় , তা জাতীয় অর্থনীতিতে ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলছে। মূলত: ব্যাংকের সুদের কারণে মানুষ নিজেদের
টাকা-পয়সা কোথাও না খাটিয়ে বা উৎপাদনশীল কোন কাজে না লাগিয়ে ব্যাংকে ফেলে রাখে। যারা ধনী তারা কাজ না করে ব্যাংক সুদের উপর নির্ভরশীল হওয়াকে সহজ মনে করছেন।

যে সমাজে বেশীরভাগ মানুষ কাজ করে না , সেখানকার অর্থনীতি উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা তেমন থাকে না। অথচ , এই অর্থনৈতিক উন্নতির উপর দেশের অগ্রগতি নির্ভরশীল। বর্তমানে যে রীতি-নীতি প্রচলিত , তাতে পত্র-পত্রিকায় ব্যাংকের বিজ্ঞাপন বের হয়ে এভাবে , " ব্যাবসাতে টাকা খাটানো এখন বন্ধ করতে পারেন। বরং ছুটি উপভোগ করুন"--- এ সব বিজ্ঞাপনকে মনে হয় সহজ-সরল ও আকর্ষণীয় । কিন্তু , আসলে তা দেশের কল্যাণ ও সম্পদ বৃদ্ধি না করে ধ্বংস ডেকে আনে।

যে অর্থনৈতিক পুঁজি দ্বারা পুষ্ট হয় না , তা ধ্বংস হয়ে যায়। অলস টাকা যা ব্যাংকে একাউন্টে পরে থাকে , তা একটি অর্থনৈতিক সমস্যা মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ। যারা অর্থনীতিতে অবদান রাখে না , তারা ব্যাংকে টাকা জমা রাখে ও ছুটি উপভোগ করে ; তারা দীর্ঘমেয়াদে গিয়ে এর পরিণাম ভোগ করে। তাদের যে টাকা ব্যাংকে অলস থাকে , তা সময়ের সাথে ক্রমাগত মূল্য হারায়। মূল্যস্ফীতির সাথে তাল মিলিয়ে এর দাম বাড়ে না। যে অর্থনীতি উৎপাদনশীলতা নির্ভর , সেখানে সামগ্রিকভাবে সবার লাভ হয়।
আল্লাহ মানুষের কল্যাণে টাকা খরচ করতে নির্দেশ দিয়েছেন-" হে বিশ্বাসীগণ; নিশ্চয়ই অনেক পুরোহিত ও পাদ্রী অন্যায়ভাবে লোকদের ধন-সম্পদ খাচ্ছে এবং তাদেরকে আল্লাহ'র পথ থেকে বিরত রাখছে। আর যারা সোনা-রুপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহ'র পথে ব্যয় করে না , তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সু-সংবাদ দাও
(সুরা তওবা; ৯: ৩৪)। "

সম্পদ যারা জমা করে রাখে , আল্লাহ তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির খবর এই সুরায় দিয়েছেন। যে সমাজে কুরআনের নীতি প্রয়োগ করা হয় , সে সমাজ মানুষের জন্য কল্যাণকর হয় ও উপকারী নীতিগুলি সমাজে চালু থাকে।

আল্লাহ সুদকে নিষিদ্ধ করেছেন ও সুদের ভারে জর্জরিত হওয়া থেকে মানুষকে রক্ষা করেছেন- " যারা সুদ খায় , তারা (কেয়ামতের দিন) শয়তানের ছোঁয়া পাগলের মত সোজাসুজি দাঁড়াতে পারবে না; এটা এজন্য , যেহেতু তারা বলতো , ব্যাবসা বাণিজ্যও তো সুদের মত। আল্লাহ ব্যাবসা-বাণিজ্যকে হালাল করেছেন ও সুদকে হারাম করেছেন। অতএব , যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্দেশ এসেছে , অত:পর সে (সুদ থেকে) বিরত রয়েছে , সে আগে যা খেয়েছে , তার ব্যাপারটি আল্লাহ'র এখতিয়ারে। আর যে আবারো সুদ খায় , তারাই জাহান্নামী সেখানে তারা চিরকাল থাকবে " (সুরা বাকারা; ২: ২৭৫)।

অন্য আরেকটি আয়াতে গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে , সুদ মানুষের জীবনে সমৃদ্ধি আনে না। " আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন ও দান খয়রাতকে বাড়িয়ে দেন; আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে পছন্দ করেন না " (সুরা বাকারা; ২: ২৭৬)। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সামাজিক জীবনের সব স্তরেই শান্তি , শৃঙ্খলা , স্থিতিশীলতার দরকার আছে। এটা অর্থনীতির জন্যও সত্য। তারাই বিশ্বাসী যারা সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু করতে দায়িত্ব অনুভব করে। অন্য কেউ কখন উদ্যোগ নিবে , সেই আশায় বসে থাকার সময় আমাদের নেই। কেননা , আল্লাহ প্রত্যেক বিশ্বাসীর উপর এই দায়িত্ব ন্যাস্ত করেছেন।

এই দায়িত্ব পালনের জন্য , প্রথমে একজন বিশ্বাসীকে অন্য মানুষের কাছে ধর্মের কথা , মানুষের জীবনে ধর্ম কী কল্যাণ বয়ে আনে , সেই বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। যে সম্প্রদায়ের সদস্যরা এটা সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করে যে , সুদ নয় বরং মানুষের কল্যাণে নিজ সম্পদ থেকে ব্যয় করলে তাতেই সমৃদ্ধি আসে , তারা কোনরকম দ্বিধা ছাড়াই প্রয়োজনের বেশী সম্পদ মানব-কল্যাণে দান করে। এ ধরনের নীতি সমাজের জন্য উপকারী । তবে , মানুষ যেন মনে না করে যে , এমন সমাজ ব্যবস্থা অবাস্তব বা কল্পনার। এজন্য মানুষকে কুরআনের শিক্ষা দিতে হবে।

এটার উপর গুরুত্ব দেয়া জরুরী যে , কুরআন ও সুন্নাহ'র আদর্শে গড়া যে সামাজিক জীবন-ব্যবস্থা , সেখানে মানুষ শুধু নিজের স্বার্থে সংগ্রাম করে না ; বরং জনকল্যাণে কাজ করে। কেননা , ইসলামী মূল্যবোধের দাবী হলো পারস্পরিক সহযোগীতা , সহমর্মিতা ও একতা। আল্লাহ যেহেতু নিষেধ করেছেন , বিশ্বাসী মানুষেরা তাই অন্যের অধিকার নষ্ট

করে না। কেউ অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পত্তি বা অধিকার কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করে না। কেউ ওজনে কারচুপি করে না বা প্রতারণা করে না। যে সমাজ কুরআনের আদর্শে গড়া , সেখানে অবিচার হতে পারে না। এর পরিণামে , সুদের কুফল দুর হয়।

ধনীরা গরীবকে শোষণ করতে পারে না ও মানুষ অন্যের অংশ অন্যায়ভাবে দখলের চেষ্টা করে না। ধর্মীয় মুল্যবোধ যে সমাজে প্রয়োগ করা হয় , সেখানে কোন কিছুর অপচয় হয় না। মানুষ ভোগ করে কিন্তু অপচয় বা অপব্যয় করে না। সহযোগিতা ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে উন্নত জীবন আদর্শ ও কল্যাণ বজায় রাখে । এই সত্যের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো ইসলামের প্রাথমিক সোনালী যুগের সমাজে মানুষরা , যারা কুরআন ও সুন্নাহ'র নীতি মেনে চলতো।

ধর্মীয় মুল্যবোধ আদেশ করে অভাবী ও ইয়াতীমদের রক্ষা করতে:-

"তোমাদের মধ্যে যারা সম্পদ ও প্রাচুর্যের অধিকারী , তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে , আত্মীয়স্বজন ও অভাবীকে এবং আল্লাহ'র রাস্তায় যারা হিজরত করেছে তাদেরকে কিছুই দেবে না ; তারা যেন ওদেরকে ক্ষমা করে ও ওদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে , আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন ? আল্লাহ ক্ষমাশীল , পরম দয়ালু (সুরা নূর; ২৪: ২২)।

বর্তমান সময়ে অভাব শুধুমাত্র আর নির্দিষ্ট কিছু দেশেই সীমাবদ্ধ নেই। বিশ্বের প্রধান প্রধান আলোচ্য সুচীতে শিশুদের সমস্যা প্রাধান্য পেয়ে থাকে। বিশ্বে লাখ লাখ শিশু রাস্তায় আবর্জনা ঘেটে জীবন পার করছে। শীতের রাতগুলি খোলা আকাশের নীচে কাটায়। খুব অল্প অর্থের বিনিময়ে অনেক শিশুই বিভিন্ন বিপদজনক্ কাজে জড়িয়ে পড়ে যাতে অনেক সময় তাদের জীবন বিপন্ন হয়। অপুষ্টি ও অভাবের কারণে শিশু মৃত্যুর সমস্যা থেকে এই বিশ্বের একটি বড় অংশই নিরাপদ নয়। পথের ছিন্নমুল শিশু ও দারিদ্র সংক্রান্ত যে পরিসংখ্যানগুলি আছে , শুধুমাত্র সেইগুলি দেখলেই বোঝা যায় সমস্যা কত ভয়ংকর।

১৯৮২ সালে ইউনেস্কোর প্রতিবেদনে বলা হয় , ছিন্নমুল শিশুদের সংখ্যা ইস্তাম্বুলে ২০০,০০০; বোগেটায় ১০,০০০ ও রিও ডি জেনিরিওতে দুই মিলিয়ন। আফ্রিকাতে এই সংখ্যা দরা হয় ৫ মিলিয়ন এবং তা ক্রমাগত বাড়ছে। যুদ্ধ , অভাব , এইডস ও দ্রুত নগরায়নের ফলে এসব পথশিশুদের সংখ্যা বাড়ছে। পুরো পৃথিবীতে ৩০ থেকে ৭০ মিলিয়ন শিশু গৃহহীন । (টীকা ৫: http://www.uia.org/uiademo/pro/d5980.htm)

আমেরিকায় গরীব শিশুদের আশংকাজনকভাবে বাড়ছে। ১৯৭৯-১৯৯৪ সালের মধ্যে ছয় বছরের নীচে গরীব শিশুদের সংখ্যা ৩.৫ মিলিয়ন থেকে বেড়ে হয় ৬.১ মিলিয়ন । ১৯৯৪ সালে ছয়ের কম বয়সী শিশুদের অর্ধেকই গরীব বা প্রায় গরীব পরিবারে বাস করতো। এই ৬.১ মিলিয়ন অভাবী শিশুদের পাশাপাশি আরো ৪.৮ মিলিয়ন শিশু বেশ গরীব অবস্থায় জীবন কাটিয়েছে।

উপরের পরিসংখ্যানে দেখা যায় , এমন কী ধনী দেশগুলিও অভাব থেকে মুক্ত নয়। অর্থনৈতিক মন্দা থেকে সৃষ্ট বেকারত্ব ও অপর্যাপ্ত সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধা কম-বেশী এই অভাবের জন্য দায়ী।
কুরআন ও সুন্নাহ'র আদর্শ গরীব ও অভাবীদের রক্ষার কথা বলে। আল্লাহ'র রাসূল (দ:) এর অনেক বাণী আছে যেখানে হযরত মুহাম্মাদ (দ:) বিশ্বাসীদেরকে গরীবদের সাহায্য করতে বলেছেন। এদের মধ্যে একটি হলো : গরীবদের ভালবাসো ও তাদের কাছে যাও। তুমি যদি তাদেরকে ভালবাসো , তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন ; তুমি যদি ওদের দেখাশোনা করো , আল্লাহ তাহলে তোমাকে দেখবেন; তুমি তাদেরকে পোশাক দিলে আল্লাহ তোমাকে পোশাকে আচ্ছাদিত করবেন। তুমি গরীবদেরকে খাওয়ালে , আল্লাহ তোমাকে খাওয়াবেন। আল্লাহ তোমাকে দয়া করবেন যদি তুমি অন্যকে দয়া দেখাও (টীকা ৭: *রামুজ আল হাদীস , খন্ড ১ , পৃষ্ঠা ১৭ , সালমান আল ফারসী (রা:)*।

সাবেক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে অভাবের একটি ভিন্নমাত্রা আমরা দেখি , যা উন্নত বা ৩য় বিশ্বের দেশগুলিতে দেখা যায় না। বলতে গেলে , সব মানুষেরই জীবনযাত্রার মান থাকে নীচুতে। এসব দেশে অভাব বলতে গেলে পুরো জনগণকে প্রভাবিত করে। পরিণামে পুরো দেশের উপর এর প্রভাব পড়ে। শহরের অবকাঠামো ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থাদি অপর্যাপ্ত বলে প্রমাণিত হয়। যেমন , খাদ্যের স্বল্পতা। বেশীরভাগ দেশগুলির মতো এসব দেশে কোন মানুষের হাতে অর্থ থাকলেও কেনার মতো পর্যাপ্ত খাবার ও জিনিষ বাজারে থাকে না।

অভাবের কারণ কী কী , তা নিয়ে লম্বা একটা তালিকা তৈরী করা সম্ভব। তবে , এটা না করে সমাজে অভাবের প্রতিক্রিয়া এবং তা দুর করা নিয়ে আলোচনা করলে সেটা বেশী উপকারী। পরের অধ্যায়গুলিতে অভাব নিয়ে বিভিন্ন সমস্যার কথা থাকবে।

অভাবের ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া:

কোন সন্দেহ নেই , অভাবের কারণে শিশুরাই সবচেয়ে বেশী কষ্ট পায়। গরীব বিশেষ করে গৃহহীন শিশুরা অনেক সময় সরকারী স্কুলে পড়ার সুযোগ পায় না। কারন , তাদের কোন স্থায়ী ঠিকানা নেই , বয়সের সার্টিফিকেট নেই; সুস্বাস্থ্যের সার্টিফিকেট যেমন রোগ প্রতিরোধ টীকা ও ইনজেকশন দেয়ার কোন রেকর্ড এদের থাকে না। খুব কমই তারা পেট ভরে খেতে পারে। বেশীরভাগ গরীব শিশুই কঠিন শ্রমে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। অনেক দেশে , বাচ্চারা এমন কী পরিবারের সদস্যদের দ্বারাই কর্মক্ষেত্রে 'ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি হয়ে যায়।
বেশীরভাগ শিশুই খুব কম টাকা-পয়সা রোজগার করে। এসব শিশু স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য হয় ; যা অনেক সময় এদেরকে মৃত্যুর মুখোমুখি করে। ভারতে জনসংখ্যা হলো ৯৪০ মিলিয়ন। এর মধ্যে শিশু শ্রমিক আছে আছে ৪৪-১০০ মিলিয়ন ----যা পুরো পৃথিবীর অন্য সব দেশের মোট শিশু শ্রমিকদের চেয়েও বেশী। পাকিস্তানের জনসংখ্যা ১২০ মিলিয়ন । শিশু শ্রমিকদের সংখ্যা আনুমানিক ৮ মিলিয়ন (টীকা ৮: . *Time*, April 15, 1996, p.36-39।

এসব গরীব শিশুদের দু:খজনক অবস্থা বিশ্বের অন্যান্য গরীব শিশুদের থেকে আলাদা কিছু নয়। কাজের ধরণ ও পরিবেশ খুবই নির্মম---তবুও ছোট ছোট শিশুরা এসব পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে--সারা বিশ্বেই এ ধরনের চিত্র আমরা দেখছি। কিন্তু তা সত্বেও , এসব কর্মজীবী শিশুদের জন্য কল্যাণকর চিন্তা যেমন শিক্ষা , স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে নিয়োগকারী দেশ চিন্তা করে যে , কিভাবে এসব শিশুদের দিয়ে সস্তায় উৎপাদন করিয়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে লাভ করা যায়। বিভিন্ন মিটিংয়ে তাই শিশুদের কিভাবে কঠিন শ্রম থেকে বাঁচানো যায় এ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তারা পরামর্শ করে কিভাবে তারা প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ব্যবসা বাড়াবে (টীকা ৯: *Time*, April 15, 1996, p.36-39)\

বিশ্বের অনেক দেশই বাজেটের একটি বড় অংশ প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ দেয়। ভারত ও পাকিস্তান --- এই দুই দেশেই শিক্ষা , স্বাস্থ্য ও শিল্প খাতগুলিতে জরুরী সংস্কার দরকার---অথচ এরাও এক্ষেত্রে আলাদা নয়। পাকিস্তান তার বাজেটের ৬০% বরাদ্দ করেছে যুদ্ধাস্ত্র ও প্রতিরক্ষা খাতে। যদিও এখানকার বেশীরভাগ মানুষই অভাবের শিকার তবুও এই পরিস্থিতি বদলাচ্ছে না। পারমাণবিক অস্ত্রের পেছনে আমেরিকা বছরে খরচ করে ৩৫ বিলিয়ান ডলার। ১৯৪৬ সালে যখন আণবিক বোমার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় ; তখন থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫.৫ ট্রিলিয়ন ডলার খরচ হয় (টীকা ১০: 10. *Nando Times*, 1 July 1998)।

কোন সন্দেহ নেই , প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধাস্ত্রের পিছনে যে ব্যয় বরাদ্দ করা হয় তা , অভাবী মানুষদের জন্য খরচ করলে গরীবদের কষ্ট দুর হতো। অভাবের কারণে শিশুদের জীবন বিপন্ন হওয়া সত্বেও রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও হিসাব নিকাশে কায়েমী স্বার্থ প্রাধান্য পায় ও গরীবদের স্বার্থ চাপা পড়ে যায়।

একটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা খাতে খরচ এড়ানোর কোনই উপায় নেই। কেননা , ধর্মহীনতা বয়ে আনে আরো দ্বন্দ্ব , বিশৃঙ্খলা , হিংসা ও সন্ত্রাস। মনে হয় যে , এসব সমস্যা থেকেই যাবে। তাই , একটি দেশকে অস্তি ত্ব বজায় রাখতে প্রতিরক্ষা বাহিনীর উপর নির্ভর করতে হয়।

বিপর্যয় সব জায়গাতেই। সমস্যার উপর শুধু বক্তৃতা দিলে বা সমস্যা এড়িয়ে গেলে বা শুধু দান-খয়রাতে কার্যকর কোন সমাধান আসে না।

অন্ন , বস্ত্র , শিক্ষা ও আশ্রয় বিষয়ক বিভিন্ন নিয়মিত কর্মসূচীর মধ্যে সমন্বয় সাধন এক্ষেত্রে অপরিহার্য। এটা কেবল তখনই সম্ভব যখন মানুষ কুরআনের আদর্শে জীবন গড়ে সংবেদশীলতা অর্জন করে।

কুরআনের মুল্যবোধ শান্তিপূর্ণ পরিবেশের নিশ্চিত করবে যা একটি দেশকে এতটা অনুভূতিসম্পন্ন করবে যে , তারা অন্য দেশের অধিকারকে ক্ষুন্ন করবে না। পরিণামে প্রতিরক্ষা বাজেট সীমিত করা সম্ভবপর হবে ও সেই অর্থ সামাজিক নিরাপত্তা , শান্তি , উন্নত শিক্ষা ইত্যাদি জনকল্যাণমুলক খাতে ব্যয় করা যাবে। প্রতিরক্ষা খাতে খরচের বিষয়টি একটি মাত্র উদাহরণ । এ রকম আরো অনেক সমস্যার সমাধানও সম্ভব হবে।

কুরআন ও সুন্নাহ'র আদর্শের মধ্যে অন্যান্য সমস্যার সমাধানও রয়েছে। এটা এভাবে যে , একজন মানুষ যে কুরআন ও হাদীসের আদর্শে বাস করে , তার পক্ষেই সম্ভব নিজের খাবার থেকে ক্ষুধার্ত বা ইয়াতীমকে ভাগ দেয়া যদিও সে নিজেই তখন ক্ষুধার্ত। এমন ব্যক্তি কোন খারাপ জিনিষ যা নিজে অপছন্দ করে , তা সে অন্য কাউকে দান করে না। সে এমন ব্যক্তি যে অন্যকে সাহায্য করে , কিন্তু তার কাছ থেকে প্রতিদান আশা করে না।

ধনীদের আচরণ কেমন হবে , তা আল্লাহ পাক্ কুরআনে সুরা নুরে বলে দিয়েছেন : "তোমাদের মধ্যে যারা সম্পদ ও প্রাচুর্যের অধিকারী , তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে , তারা আত্মীয়স্বজন ও অভাবীকে এবং আল্লাহ'র রাস্তায় যারা হিজরত করেছে তাদেরকে কিছুই দেবে না ; তারা যেন ওদেরকে ক্ষমা করে ও ওদের দোষ উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে , আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন ? আল্লাহ ক্ষমাশীল , পরম দয়ালু (সুরা নূর; ২৪: ২২)।

গরীবদের ব্যপারে একজন ধনীর করণীয় কী , তা কুরআনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন , আল্লাহ বলেছেন ধনীর সম্পদের গরীবের অধিকার রয়েছে। আল্লাহ বলেন , কিছু মানুষ নিজেদের অভাবের কথা কাউকে বলে না। কিন্তু , এদের অধিকারও রক্ষা করতে হবে। " এবং তাদের ধন –সম্পদে অভাবী ও বঞ্চিত প্রার্থীর অংশ নির্ধারিত রয়েছে (সুরা যারিয়াত; ৫১: ১৯);

" দান সে সব অভাবী লোকের জন্য যারা আল্লাহ'র পথে আবদ্ধ হওয়ার কারণে জীবিকার অন্বেষণে যমিনে ঘোরাফিরা করতে পারে না। তাঁরা মানুষের কাছে চায় না বলে অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁদেরকে ধনী মনে করে ;

তুমি লক্ষণ দেখেই তাঁদের চিনতে পারবে। তাঁরা মানুষের কাছে কাকুতি মিনতি করে চায় না ; তোমরা সৎ পথে যা দান করছো , তা সম্পর্কে আল্লাহ অবশ্যই জানেন" (সুরা বাকারা; ২: ২৭৩)।

যারা দেশত্যাগে বাধ্য হয় , সেই সব উদ্বাস্তুদের কষ্ট ও যন্ত্রণা:

বিশ্বব্যাপী অভাবের অন্যতম পরিণাম হলো উদ্বাস্তু সমস্যা। ভাল কাজের সুবিধা বা উন্নত জীবনের আশায় অথবা অভাব ও জীবন সংগ্রামে বিপর্যস্ত মানুষ অনেক সময়ই গণহারে স্থান বদলায়। ফলে অনেক সময় , দুই দেশের মধ্যে গুরুতর ঝগড়া-বিবাদ-সংঘর্ষ লেগে যায়।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি থেকে আশ্রয়প্রার্থীদের আগমনকে প্রথমে অনেক দেশই স্বাগত জানিয়েছিল ; এবং উচ্চ পর্যায়ের আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে পশ্চিমা দেশগুলিতে সস্তায় শ্রম সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। বিদেশী শ্রমিকদের অল্প মজুরী ও কঠিন পরিস্থিতিতেও কাজ করার প্রবণতার জন্য এমনটি হয়েছিল।

অনেক দিন ধরেই বিদেশী শ্রমিকরা এসব দেশের অর্থনীতিতে অবদান রেখেছে। কিন্তু , যখন এসব দেশ অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ও উন্নতি অর্জন করে ; তখন তারা আর বিদেশী শ্রমিক রাখতে চায় না ও নিজ দেশের মানুষকে কাজে নিয়োগ দিতে চায়। যেমন , মালয়েশিয়া বিদেশী শ্রমিকদেরকে জোর করে নিজ সীমানা পার করায়। এসব মানুষ যারা মালয়েশিয়া এসেছিল উন্নত জীবনের আশায় , তারা বছরের পর বছর এদেশে কাজ করে নিজ নিজ দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

শুধুমাত্র উন্নত জীবনের আশাতেই মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় না। এক দেশের সাথে অন্য দেশের সংঘর্ষও মানুষকে বাধ্য করে আশ্রয়ের সন্ধানে বের হতে। যুদ্ধ পরবর্তী অভাবের জন্য একটি দেশের বেশীরভাগ মানুষ ঘরছাড়া হয়। যুদ্ধ থেকে বাঁচাতে হাজারো মানুষকে পালাতে দেখে কিছু দেশ আশ্রয়হীনদের গ্রহণ করতে সম্মতি দেয়। প্রচন্ড শীতের মধ্যে অনেক সময় উদ্বাস্তুরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ হেঁটে চলে কোন গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে নিরাপত্তার আশায়। কিন্তু , অনেক সময়ই তারা আশাহত হয়।

১৯৯৮ সালের মার্চে ৩০০,০০০ এর বেশী মানুষ কসোভার বিভিন্ন শহর ছেড়ে পালায়। পালানোর সময় তীব্র শীতে অনেকেই মারা যায়। ১৯৯০ সালের নবেম্বরে

রাশিয়ার আক্রমন থেকে বাঁচতে চেচেনরা পায়ে হেঁটে প্রতিবেশী দেশগুলিতে যায়। কিন্তু , ঐ সব দেশ নিজ নিজ সীমানায় কড়া পাহারা বসায় এবং পারাপারের জন্য কঠিন নিয়ম-কানুন বানায় । এরা চেচেনদের আশ্রয় দিতে অনীহা প্রকাশ করে। অবশেষে , তুরস্কের সীমানায় যখন এসব আশ্রয়হীনেরা এসে পৌঁছায় ও আশ্রয় পায় ; তখন দেখা যায় যে , প্রচন্ড শীতে অনেক নারী , শিশু , বৃদ্ধ এরই মধ্যে মারা গিয়েছে।

আফ্রিকাতে জাতিগত সংঘর্ষের কারণে হাজার হাজার মানুষ উদ্বাস্তু হয়। যেমন , জায়ারে সংঘর্ষ ঘটে Hutus ও Tutsis এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে। ফলে , হাজারো মানুষ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর শিকার হয়। তারা অন্য দেশে আশ্রয়ের চেষ্টা চালায় কিন্তু সেসব দেশে ঢুকতে ব্যর্থ হয়। (বিস্তারিত জানতে পড়ুন ' বর্ণবিদ্বেষ' অধ্যায়টি)।

কুরআন ও সুন্নাহ'র মুল্যবোধ অবশ্য একদমই ভিন্ন ধরনের সামাজিক কাঠামোর ভিত স্থাপন করে। এই সমাজে গরীব ও বাস্তুহারাদের অধিকার সংরক্ষিত থাকে। এদের অবস্থার উন্নয়ন ও কষ্ট কমানোর জন্য সব ধরনের চেষ্টাই গ্রহণ করা হয়। বিশ্বাসী মানুষেরা ত্যাগ স্বীকার এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে না।

হযরত মুহাম্মাদ (দ:) এর সময় যারা আল্লাহ'র রাস্তায় ঘর-বাড়ি ছেড়েছিল , তাদের প্রতি বিশ্বাসীদের মনোভাবের মধ্যে ইসলামী আদর্শ লক্ষ্য করা যায়- " ..মুহাজিরদের আসার আগে যারা এই নগরীতে বাস করেছে ও ঈমান এনেছে , তারা মুহাজিরদের ভালবাসে ও মুহাজিরদের যা দেয়া হয়েছে তার জন্য মনে আকাঙ্খা রাখে না , আর তারা তাদেরকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্থ হলেও। যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে , তারাই সফলকাম " (সুরা হাশর ;৫৯:৯)।

" এই সম্পদ অভাবগ্রস্থ মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি থেকে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহ'র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে ও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। এরাই তো সত্যাশ্রয়ী " " (সুরা হাশর ;৫৯:৮)।

এই আয়াতগুলিতে পরিষ্কার বোঝা যায় , কুরআনে যে আদর্শের কথা বলা হয়েছে , তা বর্তমানে আমরা যা দেখি তা থেকে একদমই আলাদা। কুরআনে সাহায্য প্রার্থীর আবেদনে সবসময় ভদ্রতা ও দয়ার সাথে সাড়া দিতে বলা হয়েছে। যারা কোন সমস্যায় বা অভাবে আছে , তাদের জন্য বিশ্বাসীরা সর্বাত্নক সাহায্যের চেষ্টা করে। গরীবকে সাহায্যের সময় কুরআন দাবী করে যে , আশ্রয়দাতারা কোন দুর্বলতার পরিচয় দেবে না । যেমন, নিজের অভাবের কথা বলা বা সাহায্যের দ্রব্যের দিকে নজর লোভ করা। এসব আদর্শ অনেক সমস্যার সমাধান করে।

ধর্মহীন সমাজে নৈতিকতার অবক্ষয়:

“ এবং যেদিন উপস্থিত করা হবে কাফিরদেরকে জাহান্নামের কাছে , সেদিন বলা হবে তোমরা তোমাদের সুখ পার্থিব জীবনেই উপভোগ করেছ , সুতরাং আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর আযাবের শাস্তি দেয়া হবে; কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করতে এবং যেহেতু তোমরা পাপাচার করেছিলে (সুরা আহকাফ; ৪৬: ২০)।

জীবনের মুল উদ্দেশ্য থেকে সরে যাওয়ার অর্থ হলো নিজের মুল্যবোধকে হারিয়ে ফেলা। এই ব্যপারটি সেই মানুষের কাছ থেকে আশা করা হয় না , যে জানে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই জীবনের সমাপ্তি পৃথিবীতে অবশ্যই একদিন ঘটবে। একইভাবে যেই ব্যক্তির কাছ থেকে মানবিক গুণাবলী আশা করা যায় না , যে ভাবে না যে , এই পৃথিবীর কর্মকান্ড এক পরীক্ষা ও মৃত্যুর পরে সব কিছুর ফল পেতে হবে। যে সব সমাজ এই বিকৃত নীতি ধরে আছে , তারা আধ্যাত্মিকহীনতায় ভোগে।

এই অল্প দিনের জীবনে এরা ব্যক্তিগতভাবে কিভাবে লাভবান হবে , সেই চিন্তায় প্রধানত: ব্যস্ত থাকে ও নিজের সব লোভ-লালসা চরিতার্থ করেই সন্তুষ্ট থাকে। তারা মনে করে না , এই জীবনযাপনের জন্য তাকে দায়ী হতে হবে। তাদের এ লক্ষ্য কখনোই থাকে না যে , কিভাবে আদর্শ চরিত্র গঠন করা যাবে ? কেননা , তারা ভাবে , এতে তাদের জীবনে কোন লাভ নেই । এর বিপরীতে , জীবনের প্রতি ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে তারা যে সব মানুষ উপকারী , বিবেকসম্পন্ন , সহানুভূতিশীল , সৎ তাদেরকে “ বোকা ” মনে করে । এরা দুর্বলের উপর জোর খাটায় ; সন্ত্রাস করে ও অন্যের অধিকারকে শ্রদ্ধা করে না।

আল্লাহ কুরআনে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন , যারা মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করে না ও শেষ বিচারের দিনকে অস্বীকার করে , তাদের অন্যায় কাজের কোন সীমা নেই - “সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য দুর্ভাগ্য। যারা বিচারের দিনকে মিথ্যা বলে। প্রত্যেক সীমা লংঘনকারী পাপীষ্ঠ ছাড়া আর কেউ এই দিনকে মিথ্যা বলে না ” (সুরা আল মুতাফফিফীন: ৮৩: ১০-১২)।

এসব লোকদের ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুতি ঘটে ও উচ্চকাঙ্খায় তাড়িত হয়ে এরা শুধু বেশী বেশী পেতে চায়। ধীরে ধীরে এই আকাঙ্খা এরা চারপাশের মানুষদের মধ্যেও ঢুকিয়ে দেয় ও আল্লাহ'র নির্ধারিত সীমারেখা পার করতে আগ্রহী করে তোলে। আমরা এখন এমন এক সময়ে বাস করছি , যেখানে ধর্মীয় মূল্যবোধকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেছে , এমন লোকই সংখ্যায় বেশী।

নিজেরা যা করছে , শুধু তাতেই এরা সন্তষ্ট নয় , এদের চেষ্টা থাকে অন্যদেরকেও এই অন্ধকার পথে নিয়ে আসতে। এটা এমন এক সময় যখন সব ধরনের অনৈতিকতা নব উদ্যমে বিস্তার লাভ করছে ; খারাপ কাজের কোন সীমা-পরিসীমা চোখে পড়ে না; আগ্রাসন , ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতায় শূন্যতা , নৈতিকতার অবক্ষয় , পতিতাবৃত্তি ; সম্পদ জমানোর জন্য প্রচন্ড উদ্দীপনা , যা একটি আয়াতে বর্ণণা করা হয়েছে; বিকৃত যৌন-চাহিদা ও আচরণ , নেশার প্রতি আসক্তি, জুয়া ----- ধর্মীয় বিশ্বাসহীনতার ফলে নৈতিকতার যে নানান মাত্রার অধ:পতন ঘটে , তা নিয়ে বিশদ আলোচনা এখন আমরা করবো।

নীতিহীনতার মতবাদ:

একজন অবিশ্বাসী ব্যাক্তি ও দুর্বল ঈমানের ব্যক্তি যার আল্লাহর ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস খুব একটা নেই , সে ব্যভিচার , জুয়া , চুরি ইত্যাদি কাজ যা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন ,সে সব কাজ নির্দ্বিধায় করে। এসব অসৎ কাজের মূলে রয়েছে ধর্মহীনতা। এই মতবাদে বিশ্বাসীরা ভাবে , মানুষ পৃথিবীতে হঠাৎ করেই এসেছে ও তাই স্রষ্টার কাছে মানুষের দায়বদ্ধতার কথা তারা বিশ্বাস করে না ।

বিবর্তনবাদ ধর্মহীনতাকে পরিপুষ্ট করে। বিবর্তনবাদ অনুসারে মানুষ হলো প্রাণী জগতে একটি উন্নতার সংস্করণ। সেই হিসাবে , কোন কিছুর জন্যই বা কোন কিছুর প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা নেই। শুধুমাত্র নিজের প্রয়োজনের কথাই আমরা ভাববো।

মনের যে কোন খারাপ ইচ্ছা পূরণের জন্য একজন কোন রীতি-নীতির তোয়াক্কা করবে না ; জীব-জন্ত যা করে , মানুষও ঠিক তেমনটিই করবে। সংক্ষেপে , যে মতাদর্শ কোন আধ্যাত্মিকতার দিক-নির্দেশনা দেয় না , তা নৈতিক মূল্যবোধকে বুঝতে ব্যর্থ হয়। বিখ্যাত ভোগবাদীরা ও ডারউইন মতের প্রচারকরা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে। নৈতিক মূল্যবোধকে

অবিশ্বাসীর কোন দৃষ্টিতে দেখে। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়াম প্রভিন ব্যাখ্যা করেছেন , বস্তুবাদিতা কিভাবে নৈতিকতাকে মূল্যায়ন করে।

আধুনিক বিজ্ঞান সরাসরি জানায় যে , এই বিশ্ব সংগঠিত হয়েছে যান্ত্রিকভাবে । প্রকৃতির বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নেই এই সৃষ্টির পিছনে । এই সৃষ্টির পিছনে কোন পরিকল্পনাকারী বা স্রষ্টা নেই , যাকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায়---দ্বিতীয়ত: কোন নীতিকথা বা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নৈতিকতার কথা বিজ্ঞান স্বীকার করে না। মানবজাতি মেনে চলবে --- এমন কোন নির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা নেই।

তৃতীয়ত: মানুষ হলো এক অবিশ্বাস্য রকমের জটিল যন্ত্র বিশেষ । ব্যক্তিগতভাবে একজন মানুষ নীতিবান হয় দুইটি কারণে।

১। বংশগতভাবে
২। পরিবেশের প্রভাবে।

এই তো , এটাই হলো আসল কথা।

চতুর্থত: আমরা অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে আসি যে , আমরা যখন মারা যাবো , তখন আমাদের সব কিছু মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যাবে (টীকা ১১: Philip Johnson, *Darwin On Trial*, 2.b. Illinois: Intervarsity Press, 1993, p. 126)।

এই যে , বিজ্ঞানী ও ভোগবাদী নিজেই বলছে যে , ধর্মহীনতা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করে না । এসব মানুষ ভাবে , মৃত্যুর সাথে সাথে তাদের সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। অবিশ্বাসীদের এই বিকৃত ধারণা সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে : " আমাদের এই পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন জীবনই নেই। আমরা কেউ মরবো আর কেউ জীবিত থাকবো (এই তো আমাদের জীবন) এ ছাড়া আমরা আর বেঁচে উঠবো হবো না " (সুরা মুমিনুন ; ২৩ : ৩৭)।

যারা মৃত্যুর পরে আবার বেঁচে উঠাকে স্বীকার করে না , তারা নৈতিকতার অব:ক্ষয়ের মধ্যে কোন দোষ দেখে না বা কোন কিছুর শেষ সীমা বলে তাদের কাছে কিছু নেই। এসব মানুষ ভাবে নিজের মনের ইচ্ছা যেভাবেই হোক্ তা পূরণ করতে কোন দোষ নেই। এজন্য ধর্মহীনতা হলো নৈতিক অব:ক্ষয়ের প্রধান কারণ। অধ্যাপক প্রভিনের বক্তব্যের এর সত্যতা পাওয়া যায়। অবিশ্বাসীদের বিকৃত চিন্তাধারা ও নৈতিক মুল্যবোধ সম্পর্কে তাদের চিন্তাধারার প্রমাণ এই বক্তব্যের ভিতরে পাওয়া যায়।

যারা অনৈতিক কাজে জড়িত তাদের সবার মনে হয়তো ডারউইনবাদ বা ভোগবাদিতা তত্ত্ব নেই; তবে এটা মনে রাখতে হবে যে , এসব মতের সমর্থকরা ধীরে ধীরে বিকৃত চিন্তা-ভাবনা মানুষের মনে ঢুকিয়ে দেয়। এর পরিণামে মানুষের মধ্যে বেশীরভাগই এই পার্থিব জীবনের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয় পড়ে ও পরকালের জীবনের কথা মনে রেখে এই দুনিয়ার জীবন পরিচালিত করে না।

ষাটের দশকের প্রজন্ম ইন্দ্রিয় সুখের স্বেচ্ছাচারিতার জোয়ারে ভেসে গিয়েছিল ; এর কারন বুঝতে হবে এই দর্শনের মধ্য দিয়ে যে এরা আচরণের মধ্যে সীমারেখায় বিশ্বাস করতো না। সব ধরনের অনৈতিক কাজের জন্য এই প্রজন্ম পরিচিতি লাভ করেছে। যেমন : উচ্ছৃঙ্খল যৌন-জীবন , নেশা , উদ্ধত স্বাধীনতা ও বিদ্রোহ।

ষাটের দশকে যারা ছিল প্রচলিত ধ্যাণ-ধারণার তীব্র সমালোচক , তারা তিন দশক পরে বর্তমানে হয় দেশ চালাচ্ছে বা স্কুলে শিক্ষা দিচ্ছে। যে সব অভিভাবক এখন নতুন প্রজন্মকে বড় করছে , তারাও ঐ প্রথা বিরোধী প্রজন্মের। বর্তমানে আমরা নৈতিকতার এমন অবক্ষয় দেখছি , যা বিশ্বের ইতিহাসে প্রায় নজিরবিহীন। এর কারণ , ধর্মবিশ্বাসহীন মা-বাবার কাছে বড় হয়ে বর্তমান প্রজন্ম আরো বেশী খারাপের পথে যাচ্ছে। কুরআনে আল্লাহ এমন প্রজন্মের কথা বলেছেন যারা ধর্ম সম্পর্কে অসচেতন ; কারন , তাদের পূর্ব-পুরুষদের সতর্ক করা হয় নি--" যেন আপনি সতর্ক করেন এমন মানুষদের যাদের পূর্বপুরুষদের সতর্ক করা হয় নি , ফলে তারা গাফেল রয়ে গেছে" (সুরা ইয়াসিন: ৩৬: ৬)। এই আয়াতে জোর দিয়ে আরো বলা হয়েছে , ধর্মবিশ্বাসহীন পিতা-মাতার সন্তানরা অধার্মিক হয় ও পিতা-মাতার মতো তারাও নৈতিক মূল্যবোধহীন হয়।
বর্তমান সময়ে নৈতিক দৃঢ়তার যে অবক্ষয় তা আমেরিকা থেকে হল্যান্ড , দুর প্রাচ্য থেকে রাশিয়া --চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে: এর প্রধান কারণ এমন সব মানুষদের
অস্তিত্ব যারা ধর্মীয় বিশ্বাসহীনতার কারণে মনে করে যে , তারা কারো কাছে দায়বদ্ধ নয় । বর্তমান সময়ে ধর্মহীনতা চারিদিকে এত ছড়িয়ে পড়েছে - যা বিশ্বের ইতিহাসে আগে কখনো দেখা যায় নি। সমলিঙ্গের সাথে যৌনতা এখন সমাজ জীবনে আদর্শ হয়ে দেখা দিয়েছে। একই কারণে , পতিতাবৃত্তি , পরকীয়া প্রেম , ব্যভিচার ---এসব অনৈতিক কাজকে আধুনিকতা হিসাবে দেখা হয়।

ধর্মহীনতার কারণেই মানুষ বিভিন্ন মূল্যবোধ যেমন শালীনতা , লজ্জা , ভাল ব্যবহার ইত্যাদি হারিয়ে ফেলছে। মানুষকে অত্যন্ত জোরের সাথে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে এমন সব

অনৈতিক কাজকে আদর্শ হিসাবে মনে করতে যা মাত্র কয়েক দশক আগেও নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে পুরোপুরিভাবে অগ্রহণযোগ্য ছিল। এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে , ধর্মকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে সূচনা ঘটে
অনৈতিকতার । অবশ্য অনেক মানুষের দাবী , ধর্মহীনতা সত্বেও তারা নীতিবান। উপরে উল্লেখিত কোন ধরনের অনৈতিক কাজের সাথে তারা জড়িত না। এটা সম্ভব যে , ধর্মে অবিশ্বাসী একজন মানুষ কোন রকমের দুর্নীতিতে জড়িত নয় ও সে ভবিষ্যতেও এরকম দুর্নীতিমুক্ত থাকতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ; তবে এতে এটা বোঝায় না যে তার নৈতিক চরিত্র খুব উন্নত। যে ব্যক্তি আল্লাহ'র ভয়ে উচ্চ মূল্যবোধের পরিচয় দেয , সে সবসময়ই ভাল আচরণ করবে। অন্যদিকে , যে ধর্মহীন মানুষটি দাবী করছে যে , সে কখনো ঘুষ খায় নি , যদি স্বার্থ পূরণের প্রয়োজন হয় , তখন কিন্তু সে ছেলের হাসপাতালের বিল দিতে ঘুষ নিতে রাজী হয়ে যাবে।

অবস্থার প্রেক্ষাপটে একজন ধর্মহীন পরিস্থিতির শিকার হয়ে কিছু করে যা সে নিজেও মনে করে অন্যায় বলে। যেমন , খুন করা অকল্পনীয় মনে করলেও ধর্মের ভয় না থাকলে একদিন রাগের বশে নিরপরাধ কাউকে সে মেরে ফেলতে পারে। নৈতিক মূল্যবোধ দাবী করে ধৈর্য ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির। পরিস্থিতি যাই হোক্ না কেন , একজন ভাল থাকার জন্য সংগ্রাম করবে। এরকম অনমনীয় ধৈর্য ও দৃঢ়তা প্রদর্শনের জন্য একজনের কোন একটা লক্ষ্য থাকতে হয়।

ধর্মবিশ্বাসীর সেটা আছে , কেননা তার জীবনের লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি , ক্ষমা ও বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি অর্জন। তারা জানে , আল্লাহর রাসূল হযরত
মুহাম্মাদ (দঃ) বলেছেন , কেয়ামতের দিন ওজনে সৎ স্বভাবের চেয়ে ভারী আর কিছু হবে না (টীকা ১২ঃ তিরমিযী হাদীস) ।
সেজন্য তারা ভাল থাকার সব সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। অবিশ্বাসী ও লক্ষ্যহীন একজন মানুষের কোন কারণ নেই এ ধরনের ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দেয়ার। যেমন , যারা পতিতাবৃত্তি করে জীবন চালায় , তারা দাবী করে যে , আয়ের আর কোন পথ ছিল না তাদের।

যদি তাদের আল্লাহতে ও পরকালে বিশ্বাস তাহলে থাকতো , কখনোই তারা জীবিকার জন্য এ ধরনের লজ্জাজনক কাজে জড়িয়ে পড়ার কথা ভাবতো না। ধর্মভীরু হলে তাদের জানা থাকতো সে পরকালে এ পাপ কাজের জবাবদিহি তারা করতে পারবে না ; তাই আগেই তারা আল্লাহ'র ভয়ে এই কাজ থেকে দুরে থাকতো–

“ শয়তান তোমাদের অভাব –অনটনের ভয় দেখায় ও অশ্লীলতার হুকুম দেয়। আর আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন তাঁর ক্ষমার এবং অনুগ্রহের। আল্লাহ প্রাচুর্যময় , সর্বজ্ঞ ” (সুরা বাকারা ; ২: ২৬৮)।

এই আয়াতে যে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে , সেই অভাবের ভয়ে অধিকাংশ মানুষ সব ধরনের অনৈতিক কাজে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলে। যখন বিশ্বাসী মানুষের মনের মধ্যে অনৈতিক জীবন যাপনের চিন্তাও আসে না ; কেননা, সে আল্লাহ’র করুণার প্রত্যাশী। কুরআনের একটি আয়াতে আল্লাহ গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন যে , স্রষ্টার প্রতি ভীতির কারণে বিশ্বাসীরা সৎ থাকার সংগ্রাম করে “ এবং আল্লাহ যে সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন , যারা তা বজায় রাখে , তাদের রবকে ভয় করে ; এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে। এবং যারা নিজ প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধরে , যথাযথভাবে সালাত আদায় করে , আমি তাদের যে রিযিক দিয়েছি , তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে ও যারা ভাল দিয়ে মন্দকে দুর করে ---এদেরই জন্য শুভ পরিণাম ” (সুরা রাদ ; ১৩ : ২১-২২)।

বয়স্করা যে সমস্যার মুখোমুখী হয়: ভীড়ের বাসে বৃদ্ধরা দাড়িয়ে থাকে আর কমবয়সী ছেলে-মেয়েরা তাদের চোখে চোখ রাখা এড়িয়ে সিটে বসেই থাকে। কখনো ঘন্টার পর ঘন্টা কড়া রোদে বা তুমুল বৃষ্টিতে বৃদ্ধরা লাইনে দাড়িয়ে অপেক্ষা করে। বয়সের ভারে ক্লান্ত মা-বাবার একটু বেশী যত্নের দরকার আছে। কিন্তু , এইজন্য অনেক ছেলেমেয়ের কাছেই বৃদ্ধ মা- বাবা বোঝা বিশেষ। বিশেষ করে ,মা-বাবা
যদি শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয় ,তাহলে অনেক সন্তানের কাছেই মা-বাবা আর প্রিয় থাকে না। এগুলি হলো অল্প কিছু সমস্যা যার মুখোমুখি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধদের হতে হয়। যারা বৃদ্ধ তারা শ্রদ্ধা , ভালবাসা , যত্ন পাওয়ার দাবী রাখে । জীবনের শেষ প্রান্তে এসে অবহেলা তাদের প্রাপ্য নয়। ধর্মহীন সমাজে বৃদ্ধরা শারীরিক , মানসিক, আধ্যাত্মিক সমস্যায় ভোগে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক নানা প্রতিবন্ধকতা বৃদ্ধদের জীবনযাত্রাকে কঠিন করে ফেলে। যে দুর্ব্যবহারের শিকার তারা হয় , তা তাদের সমস্যাকে অনেক গুণ বাড়িয়ে ফেলে। বৃদ্ধদের রক্ষা করতে ও তাদেরকে যথাযথ সম্মান দেখানোর জন্য কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ বৃদ্ধদের প্রাপ্য সম্মান সম্পর্কে বলেছেন “ আর তোমার রব আদেশ করেছেন যে ,তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার

করো। যদি তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তুমি তাদেরকে 'উহ্' পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে বিনম্রভাবে সম্মানসূচক কথা বলো" (সুরা ইসরা: ১৭:২৩)।

কুরআনের জ্ঞান যাদের আছে, তাদের সমাজে ও অভাবীরা কখনো সহানুভূতিহীনতা, অধৈর্য্য, সন্ত্রাস, প্রচন্ড রাগারাগি ইত্যাদির মুখোমুখি হয় না।
ধর্মে বিশ্বাসীরা বয়স্ক ও কম-বয়সী যারা, তাদের সবারই জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি করে। এই কাজের পুরষ্কার তারা শুধুমাত্র আল্লাহ'র কাছেই আশা করে। যার বিশ্বাস আছে, সে কমবয়সী বা বয়স্ক যেই হোক্ না কেন, সবসময়ই সে চেষ্টা করবে সহানুভূতিশীল, শ্রদ্ধাশীল ও বিবেচক হতে। যে সমাজ ধর্ম থেকে দুরে থাকে, সেখানে বৃদ্ধরা মানুষের কাছে নানা কারণে বিরক্তিকর বোঝা। অনেক সময় বয়স্ক মানুষদেরকে তাদের নিজেদের দোষেও আশেপাশের মানুষেরা পছন্দ করে না। যে সমাজে কুরআন ও সুন্নাহ'র নীতি মেনে চলা হয়, সেখানে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় না; কেননা, এই পরিবেশের সবাই এমন কি অতি বৃদ্ধরাও সৎ গুণাবলী প্রদর্শণের চেষ্টা করে সব ধরনের পরিস্থিতিতেই।

অসৎ কাজে জড়িয়ে পড়তে মানুষকে উৎসাহ দেয়া হয়:

আজকাল আধুনিকতা বা স্বাধীনতার নামে মানুষকে বিশেষ করে কমবয়সী ছেলেমেয়েদেরকে অনৈতিক আচার-আচরণের দিকে ঠেলে দেয়া হয়। যে সব আচার-আচরণ কয়েক দশক আগেও খুব কড়াকড়িভাবে এড়িয়ে চলা হতো, আজ তা সমাজ জীবনে একেবারে মিশে গিয়েছে।
সব ধরনের অনৈতিকতার ছাড়পত্র আজ টিভি, ট্যাবলয়েড আর ম্যাগাজিনের কল্যাণে সহজলভ্য। প্রতারণা, সমকামিতা, পতিতাবৃত্তি---মা, বাবারা আজ নিজেদের মেয়েকে এই পেশায় ঠেলে দিচ্ছে। জুয়াড়ী, তথাকথিত তারকা যাদের নৈতিক আচরণ শোচনীয়, তাদেরকে আদর্শ হিসাবে সমাজে উপস্থাপন করা হয়।

কখনো এমন হয় যে সত্যিই তারা তীব্র ঘৃণার পাত্র, কিন্তু তখনো জনগণ তাদের জীবনযাত্রাকেই নকল করে।যে ইন্দ্রিয়পরায়ন, অনৈতিক জীবন আদর্শ তারকারা মেনে চলে, সেটাকে বলা হয় আধুনিকতা; কখনো বা সেটাই সভ্যতা। এই মতবাদের একটি ফল হলো বর্তমান বছরগুলিতে মেয়েদের মত পোশাক পরা, সাজ-সজ্জা করা পুরুষদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

এই যে সমাজ এত নীচে নেমে গেছে, তা মানুষের অপরিণামদর্শিতার এক প্রতীক। বিখ্যাত মানুষেরা পরকীয়া প্রেম, ব্যভিচার, নেশা করা এসব কাজকে উৎসাহিত করে।

অসচেতন জনগণ এসব তারকাদের আচার-আচরণ থেকে শুরু করে মতাদর্শ , ধ্যাণ-ধারণা , পোশাক , ভাষা ইত্যাদি সব কিছুই নকল করে। স্বল্প বুদ্ধির মুগ্ধ ভক্তরা খুব কমই বুঝতে পারে যে , এই সব তারকারা যারা লক্ষ-কোটি জনগণের অতিরিক্ত প্রশংসা ও উচ্ছাসের পাত্র ,তারা আসলে কঠিন মানসিক , যৌন ও আধ্যাত্মিক সমস্যার মোকাবেলা করছে। তারকাদের ভিতরের খবর রাখে যারা , তারা তাদেরকে এজন্য প্রতিনিয়ত অপদস্থ করে। বেশীরভাগ মানুষই এটা বুঝতে পারে না।

আল্লাহ এই সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন , যাদের ধর্মে বিশ্বাস নেই , তাদের প্রকৃত জ্ঞান নেই- " তোমাদেরকে যা কিছু দান করা হয়েছে ,তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার ও তার শোভা মাত্র; এবং আল্লাহ'র কাছে যা আছে তা এর চেয়ে অনেক ভাল ও বেশী স্থায়ী। তবুও কি তোমরা বুঝতে পারো না ?"
(সুরা কাসাস ; ২৮ : ৬০)।

চিন্তাশীল , জ্ঞানী , বিবেকসম্পন্ন , বুদ্ধিমান মানুষ যাদের মনে আল্লাহ'র সম্পর্কে প্রচন্ড ভয় আছে ,তাদেরকে সমাজের নৈতিক কাঠামো গড়ে দিতে হবে। তারা একটি স্বাস্থ্যকর নৈতিক সামাজিক কাঠামোকে পরিপুষ্ট করবে ; খারাপ কিছুকে সমাজ থেকে তাড়াবে। কিশোর-কিশোরী ,তরুণ-তরুণীরা গড্ডালিকায় গা না ভাসিয়ে চরিত্র সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট হবে। বিবেকসম্পন্ন মানুষ তারাই যারা সমাজকে ধ্বংস নয় বরং কল্যাণের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো খোলা মনের মানুষ , যারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে সমাজকে নিয়ে।

ধর্মহীনতাকে বাতিল করায় এরা অন্ধ বিবেকহীন হয় না ও সেজন্য জীবনের মানে কী , তা তারা ধরতে পারে। আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন , এই সত্য সম্পর্কে সচেতন থাকায় এসব মানুষেরা আল্লাহ 'র কাছে দায়বদ্ধতা অনুভব করে ও উত্তম চরিত্রের পরিচয় দেয়।
যেহেতু তারা কুরআন ও সুন্নাহকে মেনে চলে , তাই তারা জ্ঞানী , বিবেকসম্পন্ন মানুষের উদাহরণ অনুসরণ করে যিনি উত্তম চরিত্রের জন্য সংগ্রাম করেন - তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনকে ভয় করে এবং আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ করে , তাদের জন্য অবশ্যই উত্তম আদর্শ রয়েছে রাসূলের মধ্যে " (সুরা আহযাব ; ৩৩: ২১)।
যারা ভাল থাকার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে তাদের প্রশংসা করলে আর উন্নত , নৈতিক মূল্যবোধগুলিকে মানুষের কাছে ভাল হিসাবে উপস্থাপন করা হলে এবং অনৈতিক আচরণগুলির নিন্দা জানালে মানুষ আর অনৈতিক কাজে সহজেই জড়িয়ে পড়বে না।

ইচ্ছাশক্তির অভাব অবিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য:
মাদকের নেশা:

মাদকের নেশা বাড়ছে , বিশেষ করে গত দশকে এই হার বিপদ্‌জনকভাবে বেড়েছে। বিভিন্ন জরীপে এই সত্য জানা গেছে যে , বেশীরভাগ কমবয়সী ছেলেমেয়েই নেশা করে থাকে। পুরো পৃথিবী জুড়ে নেশাখোরদের সংখ্যা উদ্বেগজনক। ১৯৯২ সালে এক জরীপে বলা হয় , ব্রিটেনের ১৩-১৯ বয়সের ছেলেমেয়েদের ৫০% ভাগই নেশা করে। ব্রিটেনের নেশাখোরদের মধ্যে ৩০% হলো এই কিশোর-কিশোরীরা । অন্য আরেক জরীপে প্রকাশ , ১৯৮৮ -৯৫ সালের মধ্যে নেশার পিছনে মার্কিনীরা খরচ করেছে ৫৭.৩ বিলিয়ন ডলার। (টীকা ১৩: http://www.nida.nih.gov/Infofax/costs.html)

সব ধরনের নেশা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। একজন নেশাখোরের শেষ ঠাঁই সমাজের অন্ধকার কোণে। নেশার খরচের জন্য তার দরকার থাকে প্রচুর টাকার অথচ নেশা তাকে শারীরিকভাবে অক্ষম করে তুলে কাজ করতে। এই পর্যায়ে নেশাখোর ছেলে-মেয়েরা খরচ মেটাতে আইন বিরোধী অনেক কাজে জড়িয়ে পড়ে। যেমন : চুরি , প্রতারণা , পতিতাবৃত্তি -কখনো বিপরীত লিঙ্গের সাথে বা কখনো সমলিঙ্গের সাথে ইত্যাদি। অর্থ সংগ্রহের জন্য মরিয়া হয়ে এবং ভদ্র কোন কাজে জড়িত হওয়ার যোগ্যতা না থাকায় এরা এসব অনৈতিক কাজে চিরকালের জন্য জড়িয়ে পড়ে।

কোন মানুষ নিজের ইচ্ছায় এমন নীচ জীবনের সাথে নিজেকে জড়াতে পারে , এটা কল্পনা করাও কষ্টের। কোন জ্ঞানী , বিবেকসম্পন্ন মানুষ এমনটি করতে পারে না। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অভাবে - যা ধর্মহীন ব্যাক্তিদের বৈশিষ্ট্য--এর চেয়েও বেশী ক্ষতি মানুষের হয়। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন , " নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না , বরং মানুষই নিজেদের প্রতি যুলুম করে "
(সুরা ইউনুস; ১০: ৪৪)।

কিশোর-তরুণদেরকে নেশা করতে উৎসাহ দেয়াটা ধর্মহীন মানুষদের চরিত্রের একটি দিক। মাদক ব্যবসায়ীরা নৈতিক মুল্যবোধগুলি যেমন: বিবেক , সহানুভূতি , ক্ষমা , করুণা ইত্যাদি পুরোপুরিভাবে হারিয়ে ফেলেছে । এই ব্যবসায়ীরা শুধুমাত্র আরো অর্থের লোভে নেশার জগতে কিশোর-তরুণদের নিয়ে আসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। ল্যাটিন আমেরিকা বা রাশিয়ায় মাদকের ব্যবসা সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসাগুলির একটি। বলতে

গেলে রাষ্ট্রীয়ভাবে মাদকের ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় অথবা এই মাদক চক্রকে কাজ করতে দেয়া হয়।

এই সামগ্রিক মাদক ব্যবসা চক্রের মধ্যে কোন এক পক্ষেরও যদি ধর্ম , আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস থাকতো ,তবে এই পৃথিবী মাদকের সমস্যা থেকে মুক্তি পেত। আল্লাহর প্রতি ভয় থেকে এই মাদক চক্রের সদস্যরা নেশার সাথে কোনভাবে নিজেকে না জড়াতো– –না ব্যবসার সাথে না খাওয়ার সাথে ––তাহলে চিরকালের জন্য এই সমস্যার সমাধান হতো। বর্তমানে অবৈধ মাদকেরব্যবসা ও নেশা করা বন্ধের জন্য অনেক উদ্যোগ নেয়া হলেও সেসব সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হচ্ছে। যেমন , নেশাখোরদেরকে জোর করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে নেশা ছাড়ানোর জন্য চিকিৎসা দেয়া হলে কোন লাভ হয় না। চিকিৎসার পরেও তারা পুরানো অভ্যাসে ফিরে যায়।

জেলখানায় মাদকচক্রের সদস্যরা অবৈধভাবে নেশার ব্যবসা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চালিয়ে যায়। একজন নেশাখোরকে উদ্ধার করার একমাত্র উপায় হলো তাকে দৃঢ় ইচ্ছশক্তি প্রদান করা। কেবলমাত্র ধর্মই পারে মানুষকে অদম্য ইচছাশক্তি দিতে। এমন কী , যে অবিশ্বাসীরা বাহ্যিকভাবে দৃঢ় ইচছাশক্তির প্রদর্শন করে , তাদেরও মনের গভীরে কিছু একটার সন্ধানে তীব্র আকাংখা কাজ করে , যা তাদেরকে দুর্বল করে ফেলে । শুধু আল্লাহ ও দোযখের আগুনের ভয়ই মানুষকে দিতে পারে প্রবল ইচ্ছাশক্তি , যা কেউ বা কোনকিছু পরাজিত করতে পারবে না।

কিছু লজ্জাজনক অথচ বহুল প্রচলিত আচরণ :–

পতিতাবৃত্তি , ব্যভিচার ও সমকামিতা:

জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসাবে পতিতাবৃত্তি দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। একটি বছর পার হয় , আর পতিতাদের গড় বয়স আরো কমে অর্থাৎ আরো কম বয়সী মেয়েরা বেশী করে এই পেশায় আসছে। কখনো তাদের নিজেদের পরিবারই কমবয়সী ছেলে–মেয়েদেরকে দেহ বিক্রি করতে বাধ্য করে। যে বয়সে এই সব কমবয়সী শিশুদের নিজেদেরই আদর–যত্ন–নিরাপত্তা প্রয়োজন – সেই বয়সে এদেরকে বিভৎস পেশায় ঠেলে দেয়া হচ্ছে; এটা দেখে বিশ্বের সব দেশেরই সতর্ক হওয়া উচিৎ যাতে তারা এসব শিশুদের রক্ষা করতে পারে এই প্রচন্ড ক্ষতির হাত থেকে। অথচ , ঘটে সম্পূর্ণ উল্টোটা। যেমন , ফিলিপাইনে পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য শিশুদেরকে পতিতাবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়তে উৎসাহ দেয়া হয়।

বিশ্বের অনেক দেশেই , যে সব জায়গায় শিশু পতিতা রয়েছে , পর্যটকদের প্রচন্ড ভীড় সেখানে লক্ষ্য করা যায়। আরেকটি ব্যাপক প্রসারিত অনৈতিক কাজ হলো ব্যভিচার। একটি জরীপ (National Certified Health Statiscis) অনুযায়ী আমেরিকাতে নবজাত শিশুদের ৩২% হলো এই ব্যভিচারের ফসল। অর্থাৎ প্রতি বছর ১, ২৬৭, ৩৮৩ জন শিশুর জন্ম হচ্ছে অবিবাহিত দম্পতিদের অনৈতিক সম্পর্ক থেকে। (www.thewinds.org/arc_editorials/government/world_crisis08-98.html)।

এটি মাত্র ২-৩ দশক আগেও অকল্পনীয় ছিল। বর্তমানে এটি রোজকার জীবনের অংশ হয়ে গিয়েছে। ব্যভিচার পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জীবনের যে ক্ষতি করে তা স্পষ্ট প্রমাণিত। এটা উল্লেখ করার কি কোন দরকার আছে যে , অবিবাহিত দম্পতি বা অবিবাহিত একক মা যে নিজেও অপ্রাপ্তবয়স্কা , সে যখন কোন শিশুর জন্ম দেয় ,তখন সেই শিশু জন্ম থেকেই নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে বড় হয় ? এসব শিশুদের ভবিষ্যৎ অনেক সময়ই হয় কলংকিত।

১৯৯৮ সালের ৯ মার্চ প্রকাশিত "A Sypnosis of Current World Crisis Reports" পারিবারিক কাঠামোর মুল্যবোধের অধ:পতন নিয়ে মন্তব্য করেছে , " এই শতাব্দীর শুরুতে সমাজের যে রুপান্তর ঘটে , তাতে সামাজিক তিনটি ভিত্তি নষ্ট হতে বাধ্য হয় ----প্রথমত: এ সময়ে সমাজের ভিত্তি হিসাবে পরিবার প্রথা ও নৈতিকতার মুল্যবোধ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এটি ৬০ এর দশক থেকে প্রাথমিকভাবে শুরু হয়। এখন দেশকে শাসন করে যে উগ্রপন্থীরা,তখন তারা পরিচিত ছিল ' হিপ্পি' নামে। তাদের সংক্ষিপ্ত নীতিকথা ছিল উদার ভালবাসা ।

খুব কম জনই লক্ষ্য করেছিল যে এই হিপ্পিরা আসলে উদার নয় , কেননা , তারা সবসময়ই অন্যদের সাথে ঝগড়া -মারামারি করতো ও তাদের মধ্যে আসলে কোন ভালবাসা ছিল না। যা ছিল ,তা হলো অনৈতিকতা ও অধ:পতন "। (টীকা ১৫ : *www.thewinds.org/arc_editorials/government/world_crisis 08-98.html*)

ব্যভিচার হলো একটি শয়তানী কাজ যা কুরআনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে । এ পাপ কাজ যারা করবে , তাদের জন্য পরিণামে রয়েছে দোযখের আগুন , যদি তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয়। " তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেওনা। অবশ্যই এটা অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্ট পন্থা "

(সুরা ইসরা/ বনী-ইসরাইল; ১৭:৩২)।

“ আর তারা আল্লাহ’র সাথে অন্য কোন উপাস্যের ইবাদত করে না ; আল্লাহ যার হত্যা হারাম করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না ও ব্যভিচার করে না। আর যে এমন সে তো কঠিন আযাবের মুখোমুখী হবেই ”(সুরা ফুরকান; ২৫: ৬৮)।

বর্তমানে প্রচলিত মতবাদ অনুসারে ব্যভিচার যা মানুষকে আগুনের দিকে নিয়ে যায় , তা হলো ‘ আধুনিকতা’ ও অনেক মানুষই এই পাপ কাজ করতে আগ্রহী থাকে।

মাত্র কিছুদিন আগেও সমাজের নৈতিকতার মাপকাঠিতে সমকামিতা একেবারেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। এখন এই লজ্জাজনক কাজটি সামাজিক জীবনে প্রবেশ করে ফেলেছে।সমকামীরা এখন অনেক সামাজিক অধিকার ভোগ করে যেমন : বিয়ে থেকে শুরু করে সন্তান নেয়া--অন্য মায়ের গর্ভ ভাড়া করে সন্তানের জন্ম দিয়ে সেই সন্ত ানের আইনী অধিকার লাভ করা অথবা কোন শিশুকে দত্তক নেয়া ইত্যাদি। তারা বিভিন্ন পার্টি ও ক্লাবে এবং শুধুমাত্র তাদের জন্য আয়োজিত সভায় যেতে পারে। বিভিন্ন সাময়িকী ও সংবাদপত্র আমাদের মনের মধ্যে এটা ঢুকিয়ে দেয় যে , সমকামিতা খুব জনপ্রিয় ও জীবনের একটি গ্রহণযোগ্য দিক।

সমকামিতা হলো বিকৃত যৌন – মানসিকতা । তবুও , এর পক্ষে প্রচার করা হয় যে , “প্রত্যেকের অধিকার আছে নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী কাজ করার অথবা যৌনতা উপভোগ করার; ” এক বুদ্ধিবৃত্তিক মোড়কে ঢেকে দেয়া হয় সমকামিতাকে ; ফলে এই কাজ সমাজে বৈধ হয়ে গিয়েছে। সবাই একমত হবেন যে ,সমকামী ও পতিতাদের জীবনযাত্রায় নৈতিকতার অভাব রয়েছে।

এরা সাধারণত আগ্রাসী ধরনের হয় , যাদেরকে কোন কিছু বোঝানো কঠিন। এরা অনেক অভিশাপ দেয় । নিজেদের দেহ ও বাড়ি-ঘর এরা পরিষ্কার রাখে না। এদের হৃদয় মানুষের প্রতি এতটা রাগ ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ যে , কোনরকম অপরাধবোধ ছাড়াই এরা সহজেই নিজেদের ছোঁয়াচে রোগগুলি অন্য মানুষের মধ্যে সংক্রামিত করে। এরা কোন কাজের মধ্যে গন্ডী বা বাধা মানে না। এদের মধ্যে সম্মানবোধ নেই। মানসিকভাবে এরা অসুস্থ ।তাই , আত্মহত্যা বা খুন করার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এরা।

সমাজে এদের কোন কল্যাণকর অবদান তো নেই-ই; উল্টো এরা হলো অশান্তি , উত্তেজনা , অসুস্থতা ও অনৈতিকতার কারণ। মানুষের অধ:পতন ঘটানোর জন্যই গণমাধ্যম সমকামিতাকে এত গুরুত্ব দেয়। গণমাধ্যমে ও বিনোদন জগতে যেহেতু সমকামীদের যথেষ্ট প্রবেশাধিকার রয়েছে , তাই এদের জোরদার প্রচারটা হয় খুবই ফলপ্রসু।

এভাবে এই অপপ্রচার চালানোর জন্য সমাজের নৈতিক মুল্যবোধ চিরতরে দুর্বল হয়ে পড়ে । একটি অধ:পতিত সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো ধর্মে বিশ্বাসহীনতা। সমকামিতা হলো এমন এক বিকৃত যৌন-আচরণ যার পরিণামে আল্লাহ এই দুনিয়া ও পরবর্তী জীবনে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন---যদি দোষী মানুষটি আল্লাহর কাছে সত্যিকারভাবে অনুতপ্ত হয়ে মাফ না চায়।

আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেছেন , কিভাবে হযরত লুত (আ:) এর অবাধ্য যারা হয়েছিল , তাদেরকে তিনি ধ্বংস করেছিলেন। ঐ মানুষগুলি ছিল সমকামী। তাদের বিপর্যয়ের কাহিনী ইতিহাস হয়ে রয়েছে। যখন লুত (আ:) সমকামীদেরকে বিকৃত আচরণ ত্যাগ করতে বললেন ও আল্লাহর সতর্ক বাণী তাদের কাছে পৌঁছে দিলেন ; তারা তাকে অস্বীকার করলো ও বিকৃত সমকামিতা চালিয়ে গেল।

ফলে হযরত লুত (আ:) তাদেরকে যে বিপদ সম্পর্কে আগেই সাবধান করেছিল , সেই বিপর্যয়ে তারা ধ্বংস হয়ে গেল -" সারা জাহানের মানুষদের মধ্যে তোমরা কি পুরুষদের সাথে উপগত হও? আর তোমরা বর্জন করছো তোমাদের রব তোমাদের জন্য সে স্ত্রীলোকদের সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে , বরং তোমরা তো সীমা লংঘনকারী কওম। তারা বললো : হে লুত ; তুমি যদি বিরত না হও , তবে অবশ্যই তোমাকে এখান থেকে বের করে দেয়া হবে। লুত বললেন : আমি তোমাদেরকে এ কাজকে অত্যন্ত ঘৃণা করি। হে আমার রব। আমাকে ও আমার পরিবারবর্গকে তারা যা করে , তা থেকে রক্ষা করুন। অত:পর আমি তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে রক্ষা করলাম , এক বৃদ্ধা ছাড়া , সে ছিল আযাবে নিপতিত লোকদের শামিল। এরপর অন্যদেরকে ধ্বংস করলাম। আর আমি তাদের উপর এক বিশেষ বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য এ বৃষ্টি ছিল অতি নিকৃষ্ট। এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন , কিন্ত তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়..."(সুরা শুয়ারা : ২৬:১৬৫-১৭৪)।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং এ সম্পর্কিত সংস্থাগুলি যেভাবে সমস্যার মোকাবেলা করছে তা সত্যিই উদ্বেগজনক:

এসব সংস্থার কোনটাই এই সত্যের প্রতি গুরুত্ব দেয় না যে , এই বিকৃত আচরণ করা ঠিক নয় ; এটা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে ; যার ফল হলো এই দুনিয়ায় কষ্ট ও পরকালে অন্ত হীন শাস্তি । এই বিকৃত মানুষেরা সমাজে যে অসুস্থতা ছড়াচ্ছে , তা দুর করতে হবে।

এছাড়াও , আরো জরুরী হলো এসব সমকামী মানুষদেরকে এই বিকৃত আচরণ থেকে রক্ষা করা যাতে তারা নিমজ্জিত হয়ে আছে।

বর্তমানে পৃথিবীতে কোটি , কোটি মানুষ বিকৃত আচরণ ও লাম্পট্যের মধ্যে বসবাস করছে। এরা ভ্রান্ত সব মতবাদের জন্য নীতিহীনতা , বিদ্রোহ ও সব ধরনের বিশ্রী আচরণ জীবনের অংশ করে নিয়েছে। অন্যদিকে , যে সমাজে মানুষ ধর্মে বিশ্বাস রাখে , তারা সংগ্রাম করে আরো ভাল হতে , আরো সম্মানিত হতে। রুচিবান ও সৎ হতে।

এই সঠিক পথের মানুষদের সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন , “.....আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করেছেন ও তা তোমাদের অন্তরে সুশোভিত করে দিয়েছেন। আর তিনি তোমাদের অন্তরে ঘৃণা জন্মিয়ে দিয়েছেন কুফরী , ফাসেকী ও অবাধ্যতার প্রতি। আর এরকম লোকেরাই সৎ পথে রয়েছে ” (সুরা হুজুরাত; ৪৯ : ৭)।

একমাত্র ধর্মবিশ্বাসই পারে মানুষকে খারাপ কাজ ও বিকৃত আচরণ থেকে দুরে রাখতে যার ফলে ফলে সমাজে ভাল মুল্যবোধ ছড়িয়ে পড়ে ।

আল্লাহ বলেন, “ আপনার প্রতি যে ওহী নাযিল হয়েছে তা আবৃত্তি করুন এবং সালাত কায়েম করুন। নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে । আল্লাহ’র স্মরণই শ্রেষ্ঠতর। তোমরা যা করো আল্লাহ তা জানেন ”(সুরা আনকাবুত; ২৯ : ৪৫)।

মানুষের জীবনে জুয়া ক্ষতিকর :

বর্তমান সময়ে জুয়া সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। জুয়া অন্যতম লাভজনক আয়ের পথ। আনন্দ-ফূর্তি করার নামে জুয়া খেলার পিছনে যে প্রচুর টাকা খরচ করা হয় , তা ভাল কোন কাজে যেমন: জনকল্যাণমুলক খাতগুলিতে খরচ করা যেত। মানুষের উপর জুয়ার প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর।

জুয়ার বোঝা বহন করা যে সমাজের পক্ষে সম্ভব নয় , তা টিভি ও পত্রিকার খবরগুলি পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায়। জুয়া খেলতে গিয়ে ঋণগ্রস্থ হয়ে মানুষ আত্মহত্যা করে। জুয়ার জন্য আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে পরিবারের সদস্যরা একসাথে থাকতে পারে না ; তারা মানসিক বিষন্নতায় ভোগে ; কখনো বা মানুষকে খুনও করে ফেলে ; কেননা, বছরের পর বছর কষ্ট করে যে অর্থ-সম্পদ তারা জমিয়েছিল , তা জুয়ার আসরে মাত্র কয়েক ঘন্টায় হাতছাড়া হয়ে যায়।
বিবাহ-বিচ্ছেদ হওয়া পরিবার , সমস্যায় জর্জরিত দাম্পত্য সম্পর্ক ও বেআইনীভাবে সংগৃহীত অর্থের উপর গড়ে উঠা অর্থনৈতিক এই খাত (জুয়া খেলা) নৈতিক অব:ক্ষয়ের একটি জোরালো উদাহরণ।

এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যপার , যে জুয়া খেলা সমাজের এত ক্ষতি করছে সেটার মাধ্যমেই অর্থ রোজগারের আশায় জুয়া খেলাকে প্রচন্ডভাবে উৎসাহিত করা হয় ও বৈধতা দেয়ার চেষ্টা চলে। যারা নিজেদের বিবেকের কথা শোনে , তাদের কেউ এ ধরনের কাজ করতে পারে না। যারা জুয়াকে সমাজে বহুলভাবে প্রচলিত হতে দিচ্ছে যা কিনা অনেক দু:খ-কষ্টের কারণ -- নিজেদের যখন ক্ষতি হয় , তখন জুয়ার ক্ষতির সত্যতা নিজেদের কাছে স্বীকার করে । নিজেরা চরমভাবে ক্ষতির শিকার না হওয়া পর্যন্ত এই মানুষেরা অন্য মানুষকে দু:খের পথে ঠেলে দেয়। এই ধরনের বিবেকহীনতার মূল ধ্বংস করা সম্ভব একমাত্র কুরআনের আদর্শকে মেনে নিয়ে।

আল্লাহ জুয়াকে অশোভন কাজ বলেছেন এবং মানুষকে সতর্ক করে জুয়া থেকে দুরে থাকতে বলেছেন - " ওহে যারা ঈমান এনেছো । মদ ,জুয়া , প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ণায়ক তীর --এসব নোংরা -অপবিত্র , শয়তানের কাজ ছাড়া আর কিছু নয় ; সুতরাং তোমরা এসব থেকে বেঁচে থাকো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকেও সে তোমাদের বিরত রাখতে চায়। তবে কি তোমরা এখনও নিবৃত্ত হবে না ?" (সুরা মায়িদা; ৫ : ৯০-৯১)।

ধর্মে বিশ্বাসী ও বিবেকসম্পন্ন মানুষদের জন্য এটা অবশ্য কর্তব্য যে ,জুয়া মানুষের ও সমাজের যে ক্ষতি করে তার বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করা ও মানুষকে আহ্বান করা জুয়াকে ত্যাগ করতে ।

ধর্মহীনতার কারণে হত্যা: " আর তারা আল্লাহ'র সাথে অন্য কোন উপাস্যের ইবাদত করে না ; আল্লাহ যার হত্যা হারাম করেছেন সঙ্গত কারণে ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। আর যে এমন করবে , সে তো কঠিন আযাবের মুখোমুখি হবেই "(সুরা ফুরকান; ২৫: ৬৮)।

ইসলামের মূল্যবোধ থেকে অনেক দুরে থাকায় তা সমাজের অনেক ক্ষতি করে। যেমন , ক্ষমাহীনতা , তীব্র রাগ ও লোভ , সন্ত্রাস ইত্যাদি। ধর্মহীন মানুষ যখনই মনে করে তার স্বার্থ বিপন্ন অথবা যখন সে অন্যের প্রতি প্রচন্ড রাগ ও উন্মত্ততা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না , তখনই সে মানুষ খুন করতে পারে। অসংখ্য মানুষ এমন আছে , যারা বলতে গেলে কোন কারন ছাড়াই অনেক সময় মানুষকে ছুরি মেরে দেয় হঠাৎ রাগের মাথায় বা হিংসার বশে কখনো পরিবারের সদস্যদের , কখনো বা অপরিচিত কাউকে একজন খুন করে ফেলে। এর পাশাপিাশি মানুষ খুনের জন্য পেশাদার খুনী বা অস্ত্রধারীকে ভাড়া করা

হয়। পত্র-পত্রিকা আর টিভিতে অসংখ্য খুনের খবর সামাজিক অব:ক্ষয়ের নিদর্শন। এটা ধর্মহীন মতের পরিণাম।

পুরো পৃথিবী জুড়ে প্রতিদিন হাজারো মানুষ খুন হচ্ছে। অনেক মানুষ এমন আছে , যারা মাঝরাতে ট্যাক্সী ক্যাব ড্রাইভারকে খুন করে সামান্য কিছু টাকা লুটের জন্য। অসংখ্য অস্ত্রধারী খুনী রয়েছে যারা জীবিকা অর্জন করে এমন মানুষকে খুন করে যাদেরকে তারা চেনেও না। এসব মানুষরা অযৌক্তিক অজুহাতের আশ্রয় নেয় যে যদি আমি এভাবে অর্থ উপার্জন না করি , তাহলে আমাকে না খেয়ে মরতে হবে। এসব সন্ত্রাসমুলক কাজ সংঘটিত হচ্ছে এ কারণে যে , স্রষ্টার নির্দেশিত লক্ষ্য থেকে মানুষের জীবনযাত্রা সরে এসেছে। কেউ মানুষ খুন করে আনন্দের জন্য।

কেউ নিরপরাধ মানুষদের ক্রমাগত হত্যা করেই যায়। এদের মধ্যে এমনো কেউ আছে , সে কিনা নিজের মা-বাবাকে নিজেই খুন করে অথবা খুন করার জন্য কাউকে ভাড়া করে। এটা তারা করে সম্পত্তি দখলের জন্য। কেউ হিংসা করে অন্যকে খুন করে , কেউ প্রতিশোধের নেশায় খুন করে। এই খুনের জন্য প্রয়োজনে সে বছরের পর বছর অপেক্ষা করে। কেউ বা একদম অপরিচিত মানুষকে মেরে ফেলে শুধু এই কারণে যে , ঐ খুন হওয়া মানুষটি যে দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাচ্ছিলো , সেই তাকানো খুনীর পছন্দ হয় নি। এমন মানুষও আছে যে নির্মমভাবে পুরো একটি পরিবারের সবাইকেই এমন কী নারী ও ছোট্ট শিশুদেরকেও মেরে ফেলতে পারে। কারণ হয়তো দুই পরিবারের মধ্যে শত্রুতা বা গোষ্ঠীর কোন দাঙ্গা। সন্ত্রাসীর স্কুলের ভিতরে ঢুকে পড়ে ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করে। এ ধরনের খারাপ , খারাপ খবর রোজই গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়।

এ ঘটনাগুলি কেন ঘটছে ?

এর একটি কারণ হলো , নীচের আয়াতের মুল্যবোধকে উপেক্ষা করা - " আর তারা আল্লাহ'র সাথে অন্য কোন উপাস্যের ইবাদাত করে না ; আল্লাহ যার হত্যা হারাম করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। আর যে এমন করবে , সে তো কঠিন আযাবের মুখোমুখি হবেই " (সুরা ফুরকান; ২৫: ৬৮)।

এই আয়াতে আল্লাহ মানুষকে সাবধান করেছেন যে , ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কেউ কোন মানুষকে মেরে ফেললে তাকে কষ্টকর আযাব দেয়া হবে। আল্লাহ আমাদের জানান যে , নিরপরাধ একজন মানুষকে মেরে ফেলা মানে হলো যেন পৃথিবীর সব

মানুষকেই মেরে ফেলা। আজকাল অবশ্য মানুষ হরদমই খুন করছে ; কেননা , তারা কুরআনের আদেশকে মানছে না এবং তাদের অন্তর আল্লাহ'র ভয় থেকে মুক্ত। পরকালে বিশ্বাস না থাকায় এবং সন্ত্রাসের জন্য পরকালে দায়বদ্ধ হতে হবে , এই জ্ঞান ও বোধশক্তি না থাকায় মানুষ এমন নিষ্ঠুর হতে পারে।

এমনটি অপ্রত্যাশিত যে, যে মানুষ আল্লাহ'র নির্ধারিত সীমারেখা সম্পর্কে জানে , সে তার রাগকে নিয়ন্ত্রণ করবে না এবং রাগের বশে মানুষের ক্ষতি করবে। এই পৃথিবীতে মানুষ হয়তো শাস্তি এড়িয়ে যেতে পারবে কিন্তু মৃত্যুর পর পরকালে আল্লাহ'র উপস্থিতিতে কৃতকর্মের শাস্তি এড়ানো অসম্ভব। অনন্ত শাস্তির হাত থেকে কেউ পালাতে পারবে না।

আল্লাহ এই বিষয়ে নীচের আয়াতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন – " নিশ্চয়ই যারা অস্বীকার করে আল্লাহর আয়াতকে এবং নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করে , আর যারা ন্যায় আচরণের নির্দেশ দেয় , তাদেরও হত্যা করে ,তাদেরকে মহাযন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ শুনিয়ে দাও " (সুরা আলে – 'ইমরান; ৩: ২১)।

যারা ধর্মের পথ থেকে দুরে থাকে , তারা নিষ্ঠুর প্রকৃতির সন্তানদের গড়ে তোলে: বিশ্বের আলোচ্য সূচীতে হত্যা একটি ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে ও এ নিয়ে আলোচনা বর্তমানে অনেক বেশী হচ্ছে।

এর একটি দু:খজনক কারণ হলো , অন্য শিশুর প্রতি শিশুদের নিষ্ঠুরতার মাত্রা বেড়ে গিয়েছে। স্কুলে এক শিশু অন্য শিশুদের গুলি করছে--এই ধরনের ঘটনায় বোঝা যায় সন্ত্রাসের কাছে শিশুরা কতটা অসহায়। বিভিন্ন টিভি অনুষ্ঠান আর সিনেমা এখন সন্ত্রাসী ঘটনা দিয়ে ভরপুর---এমনটি আগে ছিল না । সন্ত্রাসী দৃশ্য দেখতে দেখতে কচি শিশুদের মন-মানসিকতায় স্বভাবতই এর প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে , খুনের দৃশ্যগুলি যা অনেক সিনেমাতেই প্রাধান্য দিয়ে দেখানো হয় , তা শিশুদের ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয় ; ধর্মহীন অন্ধকার জীবনের শুরু হয়। এসব শিশু-কিশোরদেরকে এ ধরনের অন্ধকার পরিস্থিতিতে ঠেলে দেয়া ও সন্ত্রাসমুখী করে তোলার জন্য মুলত: দায়ী ধর্মহীন মানুষদের উপস্থিতি। এসব মানুষদের আল্লাহদের প্রতি ভয় নেই।

সর্বোপরি , তারা নিজেদের শিশুদেরকেও বড় করে তোলে নিষ্ঠুর স্বভাবের ও ধর্মহীন করে। ক্ষমা ,সহানুভূতি , ন্যায়-বিচার ও জ্ঞানের বদলে এসব মানুষেরা নিজেদের বাচ্চাদের মনে ঢুকিয়ে দেয় খারাপ প্রবৃত্তিগুলি -সংক্ষেপে বলতে গেলে ধর্মহীন মতাদর্শের শিক্ষা দেয়।

কুরআনে হযরত নূহ (আ:) এর দোয়ায় দেখা যায় যে ,সব অবিশ্বাসীরাই একই ধরনের নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয় --" আর নুহ আরো বলেছিলো: " হে আমার রব। আপনি পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য থেকে একজন গৃহবাসীকেও জীবিত রাখবেন না। যদি আপনি তাদেরকে জীবিত রাখেন ,তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দিবে কেবল পাপাচারী ও কাফির। হে আমার রব; আপনি ক্ষমা করুন আমাকে , আমার

মাতা-পিতাকে , যারা আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মুমিন অবস্থায় তাদেরকে ও সকল মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ; আর অত্যাচারীদেরকে সম্পুর্ণ ধ্বংস করুন" (নুহ; ৭১: ২৬-২৮)।

পুরো পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ: "হে যারা ঈমান এনেছো ; তোমরা পরিপুর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো ও শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু" (সুরা বাকারা; ২: ২০৮) । বিংশ শতাব্দী ছিল যুদ্ধ , গণহত্যা আর সংঘর্ষের । বিশ্বের ইতিহাসে নজিরবিহীন এমন রক্তক্ষয়ী ঘটনাগুলি দিয়ে এই শতাব্দী চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। এ সময়ে আমাদের চোখের সামনে লাখ লাখ মানুষ মারা গিয়েছে।

এই শতাব্দীতে আবারো লাখ লাখ মানুষ তাদের ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে ; তাদের প্রিয়জনদেরকে হারিয়েছে ; নিজেরা পঙ্গু হয়েছে , কখনো আহত আবার কখনো বা প্রতিবন্ধী হয়ে পড়েছে। নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং অনেক রাষ্ট্র ভেঙ্গে পড়ে। বিশ্বের ইতিহাসে এর প্রতিক্রিয়া গুরুত্বপুর্ণ। এ শতাব্দী দুইটি বিশ্বযুদ্ধ দেখেছে যা বিশ্বব্যাপী এক নজিরবিহীন মাত্রা পেয়েছিল। অতীতে অল্প কিছু দেশই যুদ্ধে জড়িত হতো এবং বিপর্যয় সীমিত পর্যায়ে থাকতো। অন্যদিকে শুধুমাত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়েই নব্বই লক্ষ মানুষ মারা যায় এবং দুই কোটির বেশী মানুষ আহত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও কমপক্ষে পাঁচ কোটির বেশী মানুষ মারা যায়। নির্মম সত্য হলো এই যে , যুদ্ধের শিকার এই মানুষরা কেউ যোদ্ধা ছিল না । তারা ছিল নারী , শিশু , বৃদ্ধ অর্থাৎ সাধারণ মানুষ। এরা দুই পক্ষের গোলাগুলির মাঝখানে পড়ে নির্মমভাবে মারা যায়।

বিংশ শতাব্দীতে মানুষ ' গণহত্যা ' শব্দটির সাথে পরিচিত হয়। ভিয়েতনাম , প্যালেষ্টাইন , কাশ্মির , রুয়ান্ডা , বসনিয়া ও চেচনিয়াতে অসংখ্য মানুষকে প্রাণ দিয়ে এই সব দ্বন্দ্বের মাসুল দিতে হয়। হাজার হাজার মানুষকে অত্যাচার করে চিরতরে পঙ্গু করে ফেলা হয়। কুরআনে ফেরাউনের সময়কালের বর্ণনার সাথে এই সময়ের মিল পাওয়া যায়। নিষ্ঠুর গণহত্যা যা ফেরাউনের রাজত্বে ঘটেছিল , তা সবসময়েই ঘটানো হতো গরীব , ভাসমান মানুষ ও অসহায়দেরকে লক্ষ্য করে।

ফেরাউন কিভাবে মানুষের উপর নির্মম অত্যাচার চালাতো , সে সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা এভাবে এসেছে ------"ফেরাউন তার দেশে অতি মাত্রায় উদ্ধত হয়ে গিয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের মধ্য থেকে একটি দলকে দুর্বল করে রেখেছিল---তাদের
পুত্র-সন্তানদেরকে সে হত্যা করতো এবং তাদের মেয়েদেরকে জীবিত রেখে দিত। সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী"(সুরা কাসাস ; ২৮ : ৪)। " আর স্মরণ করো , মুসা তার কওমকে বলেছিল: তোমরা মনে করো তোমাদের প্রতি আল্লাহ'র অনুগ্রহ ; যখন তিনি

তোমাদেরকে মুক্ত করেছিলেন ফেরাউনের লোকদের হাত থেকে ,তারা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি দিত ; তোমাদের ছেলেদেরকে হত্যা করতো এবং তোমাদের মেয়েদেরকে জীবিত রেখে দিত। এতে ছিল তোমাদের রবের থেকে এক বিরাট পরীক্ষা "(সুরা ইবরাহীম; ১৪ : ৬-৭)।

বর্তমান সময়ে গণমাধ্যমে যখন এই সব নির্মম গণহত্যার সচিত্র খবর আসে ,তখন আমরা দেখি , অপরাধীরা মানবতা থেকে কত দুরে অবস্থান করছে। সব ধরনের নীতি , অনুভূতি ও মানবিকবোধ বর্জিত এই মানুষেরা জানেই না , তারা কিজন্য সংগ্রাম করেছে । যুদ্ধের ব্যপারেও এই সত্য প্রযোজ্য ।
যারা যুদ্ধের পরিকল্পনা ও যুদ্ধের বীজ রোপনের জন্য দায়ী , তারা কিছু স্বার্থের জন্য এমনটি করে। অবশ্য যারা নিজেরা সরাসরি যুদ্ধ করছে ,তাদের অনেক সময় কোন ধারণা থাকে না যে , কেন তারা এই যুদ্ধ করছে। মানুষ কেন এত নিষ্ঠুর হয় ? কিভাবে নির্মমভাবে গণহত্যা চালাতে পারে ?

এর কারণ হলো , এরা এদের নেতাদের কাছ থেকে এই ধরনের মন-মানসিকতাকে মনে-প্রাণে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করেছে। যে ব্যবস্থায় মানুষের সাথে পশুর মতো আচরণ করা হয় এবং অত্যাচার করা হয় ; সন্ত্রাস আর অত্যাচারকে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করা হয় , সেখানে নীতিকথার কোন মুল্য নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে বলা যায় , পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী নেতারা যারা বর্তমান সময়ে সন্ত্রাস সংগঠিত করছে তারা আর কুরআনে বর্ণিত ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সম্পর্ক সমান্তরাল - " আর আমি তো তাদেরকে নেতা বানিয়েছিলাম, তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করতো। কেয়ামতের দিন তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না ।এ পৃথিবীতেও আমি তাদের পিছনে লা'নত লাগিয়ে দিয়েছি ও কেয়ামতের দিনে তারা হবে ঘৃণিত " (সুরা কাসাস ; ২৮ : ৪১-৪২)।

সন্ত্রাসের উৎস:

কোনরকম অনুতাপ ছাড়াই একজন মানুষ অন্যজনকে নির্মমভাবে খুন করছে কিভাবে ? আমরা যখন এর কারণ খুঁজতে গভীরভাবে অনুসন্ধান চালাই ,তখন ভোগবাদী
চিন্তাধারার মুখোমুখী হই। উনিশ ও বিংশ শতাব্দীতে আদর্শগত ধ্যান-ধারণায় এই মতাদর্শের প্রচন্ড প্রভাব রয়েছে। এই দর্শন এটাই শিক্ষা দেয় যে , ঘটনাচক্রই মুখ্য , অন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই আকস্মিক ঘটনাচক্রেরই অস্তিত্ব ছিল ও থাকবে।

আল্লাহ'র অস্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক জীবন , উত্তম মূল্যবোধ ইত্যাদিতে এরা বিশ্বাস করে না। এই বিকৃত যুক্তিবাদীরা বিতর্ক করে যে , মানুষ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম করে। মানুষ কারো কাছেই কোন কিছুর জন্য দায়বদ্ধ নয়। তাই ভোগবাদীরা বলে থাকে , মানুষ শুধু নিজের স্বার্থই দেখবে।
বিবর্তনবাদ মতবাদ ভোগদবাদীদের সমর্থনপুষ্ট। এই মতবাদ দার্শনিকদের ভ্রান্ত উপলব্ধির স্তম্ভ হিসাবে কাজ করে।

যখন এই মত প্রথম উপস্থাপন করা হয় ,তখন তা ভোগবাদী দৃষ্টিকোণকে সমর্থন করে। এভাবে , ঠান্ডা মাথায় গণহত্যা ও নির্মম নির্যাতনের ভিত এই মতবাদ স্থাপন করে দেয়। ' যে শ্রেষ্ঠ , সেই বেঁচে থাকবে '--ডারউইনের এই মতবাদ এটাই প্রস্তাব করে যে ,দুর্বল সবসময়ই ধ্বংস হবে ও যে শক্তিশালী সেই শুধু বেঁচে থাকবে।

এই Social Darwanism' দৃষ্টিভঙ্গী উনিশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদীদের বর্ণবাদী মতের মূলমন্ত্র । এই মত অনুযায়ী , দুর্বল , ভাসমান ও প্রতিবন্ধীরা এমন কী একটি পুরো জাতিগোষ্ঠী কেবল শক্তিশালীদের স্বার্থই দেখবে। বস্তুবাদীরা মানুষের জীবনকে কোন মূল্য দেয় না।

সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে , দুর্বলকে মেরে ফেলতে কোন বাধা নেই। মানুষের জীবনের প্রতি এই শ্রদ্ধার অভাব ব্যাখ্যা করে , কেন মানুষ খুন হয়ে যায় সামান্য জমির জন্য অথবা কোন প্রাকৃতিক সম্পদ দখলের জন্য। ঘটনাচক্রকেই যারা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে ও আল্লাহ'র অস্তিত্বকে যে অস্বীকার করে , সে ধীরে ধীরে সব ধরনের খারাপ কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে ও অন্যদেরকেও এই নিষ্ঠুরতার দিকে নিয়ে যায়। যদিও কুরআন মানুষের জীবনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে।

কুরআনে বলা হয়েছে , একজন মানুষকে অকারণে হত্যা করা মানে সমগ্র মানবজাতিকে মেরে ফেলা- "এ কারণেই আমি বনী ইসরাইলের প্রতি এ বিধান দিয়েছি যে , কেউ কাউকে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ কিংবা দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করার কারণ ছাড়া হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সব মানুষকেই হত্যা করলো ; আর যে কেউ কারো জীবন রক্ষা করলো , সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করলো । তাদের কাছে তো এসেছিল আমার অনেক রাসুল স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে। কিন্তু এরপরও তাদের অনেকেই দুনিয়ায় সীমা লংঘনকারীই রয়ে গেল"
(সুরা মায়িদা; ৫: ৩২)।

যে সমাজের মানুষ আল্লাহ'র আদেশ মান্য করে , সেখানে মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয় না। মানুষ অত্যাচারিত বা বিনা দোষে কারাবন্দী হয় না বা তার সাথে কেউ খারাপ আচরণ করে না।

আগেই বলা হয়েছে , কুরআনে মানুষের সাথে সদয় ও ন্যায় ব্যবহারের আদেশ দেয়া হয়েছে এবং মানুষকে সন্ত্রাস , নিষ্ঠুরতা , লোভ ও সীমা লংঘন করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে । এই পৃথিবীতে সন্ত্রাস ও অবিচারের নিন্দা করার উপায় হলো , আমার আল্লাহ , কেয়ামত দিবস , কুরআন ও সুন্নাহ'র মুল্যবোধ অন্যদের কাছে পৌঁছে দিব ।

যারা এই দায়িত্ব পালন করবে না ও বিনা কারণে এটা এড়িয়ে যাবে ,তাদের আল্লাহ'র ক্রোধ ও শাস্তির ব্যপারে ভয় পাওয়া উচিত। কারন , আল্লাহ এই পৃথিবীতে মানুষের পরীক্ষা নেন --- "আর অবশ্যই আমি তোমাদের পূর্বে অনেক মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি , যখন তারা জুলুম করেছিল , অথচ তাদের কাছে তাদের রাসুলগন এসেছিলেন স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে। কিন্তু তারা কিছুতেই ঈমান আনার ছিল না। এভাবেই আমি অপরাধী মানুষদের প্রতিফল দিয়ে থাকি। তারপর আমি তোমাদেরকে প্রতিনিধি করেছি পৃথিবীতে তাদের জায়গায় ,যেন আমি দেখে নেই তোমরা কেমন কাজ করো। "(সুরা ইউনুস; ১০: ১৩-১৪)।

যুদ্ধের কারণ: যুদ্ধ কেন হয় ? যুদ্ধের পিছনের অযৌক্তিক কারণগুলি বুঝতে হলে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কোন যুদ্ধই হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ও ততোধিক মানুষের আহত হওয়ার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে পারে না। যুদ্ধ মানবতার জন্য বেদনাদায়ক ; জাতীয় অর্থনীতিকে এটা ধ্বংস করে ,মানুষের অধিকারকে ক্ষুন্ন করে ও দুর্বৃত্তদের অন্যায়ের সুযোগ করে দেয়। যারা যুদ্ধ বাধায় তারা ক্ষমাহীন ও স্বার্থপর। সব ধরনের মানবিক গুণ যেমন সহানুভূতি , ক্ষমা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মন-মানসিকতা এদের একদমই নেই।
এরা শুধু চায় নিজেদের লোভ-লালসা মেটাতে। এছাড়া , নেতা হওয়ার প্রচন্ড বাসনা চরিতার্থ করতে এরা সবসময় ব্যস্ত থাকে।

এ ধরনের চরিত্রের বর্ণনা কুরআনে এভাবে এসেছে -"আর যখন সে ফিরে যায় ,তখন সে চেষ্টা করে যাতে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও জীব-জন্তুর বংশ বিনাশ করতে পারে। আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না। আর যখন তাকে বলা হয় : আল্লাহকে ভয় করো ,তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং দোযখই তার জন্য যথাযোগ্য স্থান। নিশ্চয়ই তা হলো নিকৃষ্ট আবাস " (সুরা বাকারা; ২: ২০৫-২০৬)।

অনেক সময় অন্য দেশের অধিকার হরণ করায় এক দেশ অন্য দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। মাত্র এক একর জমির জন্য যুদ্ধের ঘোষণা আমাদের এটাই শিক্ষা দেয় যে , এ ধরনের ঘটনা যে কোন দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। যে সব দেশ যুদ্ধে জড়িত হয় , তারা যুদ্ধাস্ত্র যেমন যুদ্ধ বিমান , বন্দুক , কামান , বোমা ,গুলি ইত্যাদি কিনতে যথেচ্ছা অর্থ খরচ করে। একই সময় দেখা যায় ,বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতগুলিতে যা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ,তা জনকল্যাণের জন্য মোটেও পর্যাপ্ত নয়।

কিছু প্রভাবশালী লবি ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ এসব যুদ্ধ–সংঘাতের সাথে জড়িত থাকে। আর যুদ্ধের বেদনাদায়ক দিক হলো যে , সবসময়ই সাধারণ মানুষেরাই এর অসহায় শিকার হয়। যুদ্ধের শেষ পরিণাম অবশ্য দুই পক্ষের জন্যই ধ্বংস ডেকে আনে। কেননা ,যারা বিদ্রোহের আগুনকে উসকে দেয় , তারা সবসময়ই এই পৃথিবীতে সমস্যায় পড়বেই। এরা কখনোই শান্তিতে থাকতে পারবে না। যারা অন্যায় করে , আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দানের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন––“ কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে , যারা মানুষের উপর অত্যাচার ও পৃথিবীতে অকারণে বিদ্রোহী আচরণ করে বেড়ায়। তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি” (সুরা আস শুরা ; ৪২ : ৪২)।

ভূ–গর্ভস্থ ; খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ , পানি ইত্যাদির জন্য অনেক সময় যুদ্ধ লাগে। কোন দেশের যখন নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদ থাকে না , তখন তারা অনেক সময় প্রতিবেশী দেশগুলিকে হুমকী দেয় , তাদের সাথে সেই সম্পদ ভাগ করে নেয়ার জন্য। এই সমস্যার সমাধান হতে পারে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ও যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে। তবুও কিছু দেশ যুদ্ধের পিছনেই তাদের সব শক্তি ও প্রভাব ব্যবহার করে।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায় , বোমা মেরে বিভিন্ন দেশের সেচ সুবিধা নষ্ট করে ঐ দেশের ক্ষতি করা অথবা ভিন্ন দেশে সন্ত্রাস চালানো ইত্যাদিতে এরা দোষের কিছুই পায় না। এর ফলে নিরপরাধ নারী ও শিশুদের মৃত্যুতে তাদের কিছু যায় আসে না।

কুরআনের আদর্শে বাস না করার ফল:

কুরআনের সুরা নিসাতে বলা হয়েছে , বিপন্নকে সাহায্য করা সব বিশ্বাসীর কর্তব্য–

আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা যুদ্ধ করছ না আল্লাহ'র পথে এবং সেসব অসহায়-দুর্বল নর-নারী ও শিশুদের জন্য যারা বলে : হে আমাদের প্রতিপালক ! এ জনপদ থেকে আমাদের বের করে নিন , এখানকার অধিবাসীরা ভয়ানক অত্যাচারী ? আর আপনার তরফ থেকে কাউকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী করে দিন (৪: ৭৫)।

এই মুহূর্তে যা করা দরকার ,তা হলো মানুষকে আল্লাহ'র ভয় দেখানো ও তাদেরকে মনে করিয়ে দেয়া যে , কিয়ামতের দিন প্রত্যেককেই সব কাজের জন্য দায়ী হতে হবে। অন্য কোনভাবে মানুষকে সাবধান করার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য ; কেননা , একমাত্র যার মনে আল্লাহ'র ভয় থাকবে ,সেই শুধু অন্যের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও অবিচার করা থেকে বিরত থাকবে। এছাড়া , অন্য কোন কিছু মানুষকে খারাপ কাজ থেকে দুরে সরিয়ে রাখতে পারে না। সাধারণত , মানুষ সব রকমভাবে চেষ্টা করে তার সব উচিত-অনুচিত কামনা-বাসনার কাছে ফিরে যেতে ; কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব যে আত্নস্থ করতে পেরেছে, সেই কেবল নিজের সম্মান 'পুনরুদ্ধার' করতে পারে। এটা সম্ভব নিজে কুরআনের আদর্শ গ্রহণ করে ও অন্যকে কুরআনের আদর্শে আহ্বান করে।

সত্যিকারের ধার্মিক যে কোন মুসলিমের কর্তব্য হলো ধর্মের আদর্শ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। ধর্মবিশ্বাসীরা অবশ্যই অন্য মানুষকে জানাবে যে , ধর্ম কিভাবে মানুষের জীবনে আশীর্বাদ , ভালবাসা , নিরাপত্তা ও বিশ্বাসের জন্ম দেয়। তাই যুদ্ধ বাধানোর কোন যুক্তিসঙ্গাত কারণই থাকতে পারে না। সব দ্বন্দ্বের সমাধান হবে শান্তিপূর্ণভাবে। এটার উপর জোর দিতে হবে যে , যদি অল্প কিছু মানুষ কুরআনকে মেনে চলে , তবে শান্তি অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। অবিচ্ছিন্ন শান্তি এই পৃথিবীতে বিরাজ করা সম্ভব , যদি সামগ্রিকভাবে কুরআন ও সুন্নাহ'র আদর্শ মেনে চলা হয়। তা নাহলে , শুধু অল্প কিছু এলাকা কুরআনের মূল্যবোধ থেকে সুফল পাবে ও অন্যরা অভাব ও সন্ত্রাসের জন্য দু:খ ও অত্যাচারের মধ্যে জীবন কাটাতে বাধ্য হবে। যে সব দেশের সাহায্য প্রয়োজন তাদের আহ্বান :

যে মানুষ আল্লাহকে ভয় করে , কুরআন ও সুন্নাহ'র আদর্শের প্রতি সবসময় অবিচল , তার জন্য জীবনের সব ঘটনার মধ্যে অনেক উদ্দেশ্য ও নিদর্শন থাকে। কেননা ,

আল্লাহ সব কিছু করেন বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে। মানুষকে তাই বিভিন্ন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। যে মানুষের মনে ধর্ম বিশ্বাস আছে , তার দায়িত্ব অনেক। যেমন , অন্যকে আল্লাহ'র অস্তিত্ব ও একত্ব সম্পর্কে বলা , ভাল কাজ করতে অন্যকে উৎসাহিত করা ও অন্যায় কাজে নিষেধ করা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই করা সেই সব মতের বিরুদ্ধে যার মূলে রয়েছে আল্লাহকে অস্বীকার করা ইত্যাদি।

মানুষ যখন ধর্মকে অবলম্বন করবে , তখন বিবেকবান সমাজের জন্ম হবে যেখানে মানুষ আল্লাহকে ভয় পায়। তখন ধর্মহীনতার কারণে সৃষ্ট সমস্যাগুলির সমাধান এমনিতেই হয়ে যাবে। বিশ্বাসীদের কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন কুরআনের এই আয়াতে – " আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না ফিতনা দুর হয় ও আল্লাহ'র ধর্ম প্রতিষ্ঠা না হয়। যদি তারা বিরত হয় , তবে যালিমদের ছাড়া আর কাউকে আক্রমণ করবে না" (সুরা বাকারা; ২: ১৯৩)। আগেই বলা হয়েছে , ভোগবাদী আদর্শ যা ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে , তার মোকাবেলা করতে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধকে প্রাধান্য দিতে হবে। নি:সন্দেহে এই মোকাবেলা হতে হবে শান্তিপুর্ণ ও আপসমূলক--যেমনটি পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে । যখন এই আদর্শের মুল ভিত ধ্বংস হবে , তখন এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা অন্য সব মতাদর্শও একের পর এক ধ্বংস হবে। আল্লাহ কুরআনে আমাদেরকে জানিয়েছেন , যখন সত্য উদঘাটিত হয়। তখন মিথ্যা ধ্বংস হয়ে যায় --" কিন্তু আমি সত্য দিয়ে মিথ্যার উপর আঘাত হানি যা মিথ্যাকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দেয় এবং সাথে সাথে মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দুর্ভোগ তোমাদের ; তোমরা যা বলছো তার জন্য" (সুরা আম্বিয়া ; ২১ : ১৮)। এজন্য যারা কুরআন থেকে অনেক দুরে রয়েছে , তাদের কাছে আমরা ধর্মের বাণী পৌঁছে দিব। এই একই কারণে আমাদের উচিৎ সব মানুষকে উৎসাহিত করা যেন তারা নিরানন্দের জগতকে পরিত্যাগ করে যা ধর্মহীনতা সৃষ্টি করে থাকে। যে দেশগুলিতে মহামারীর মত দ্বন্দ্ব -সংঘাত লেগে রয়েছে , সে দেশগুলি সম্পর্কে কিছু জানানোর জন্য বেশ কিছু পৃষ্ঠা এখানে বরাদ্দ করা হলো। শুধুমাত্র কিছু তথ্য জানানোর জন্য এই দেশগুলির উপর গুরুত্ব দিয়ে এখানে কিছু বর্ণণা করা হচ্ছে না। সেজন্য হাজারো বই , হাজার হাজার প্রতিবেদন রয়েছে। এখানে উদ্দেশ্য হলো : বিবেকবান মানুষদেরকে উৎসাহিত করা যেন তারা নির্যাতিত মানুষ যারা সমাধানের আশায় মরিয়া হয়ে রয়েছে , তাদেরকে সাহায্য করেন। এই পবিত্র দায়িত্ব সম্পর্কে বিশ্বাসীদের মনে করিয়ে দেয়াটা ও তাদেরকে যুদ্ধের সমস্যা যা বিভিন্ন দেশকে ধ্বংস করে দিচ্ছে ও নির্যাতিত মানুষকে দু:খ-কষ্টের মুখোমুখী করছে , সেই সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করাটা গুরুত্বপুর্ণ।

কারো এমনটি চিন্তা করা উচিত নয় যে ,এই যুদ্ধগুলি অনেক দুরের দেশগুলিতে হচ্ছে ; তাই আমার এ ব্যপারে কিছুই করার নেই। এটা স্পষ্ট যে , নিরাপত্তা ও সাহায্য

দানের নামে অনেক সাহায্য সংস্থাসমূহ এগিয়ে আসছে ; তবে কোন স্থায়ী সমস্যা সমাধানে এরা ব্যর্থ । এসব সংস্থাগুলি সমস্যা সমাধানে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ ও অসংখ্য কর্মী নিয়োগ করেছে। যদিও আজ পর্যন্ত তাদের কাজের ফলাফল যথেষ্ট নয় ও খুব কম মানুষকেই তারা প্রকৃত সাহায্য করতে পেরেছে। মানুষকে অবশ্যই বুঝতে হবে , যে সব মানুষ কসোভো , বসনিয়া , কাশ্মীর অথবা ফিলিস্তিনে আজ নির্যাতিত হচ্ছে , তারা একজন রক্ষাকর্তার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে ; এদের জন্য এটাই সমাধান ‘‘কুরআনের আদর্শে বাস করা”।

চেচনিয়া: উত্তরাধিকার সূত্রে বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের আলোচ্য সূচীর অন্যতম হলো রুশ – চেচান সমস্যা। রাশিয়া চেচনিয়াতে যে অত্যাচার ও হত্যাকান্ড চালাচ্ছে তার অসহায় শিকারের অধিকাংশই হলো বেসামরিক নারী ও শিশু--- এর ফলে বিশ্বের সমস্যা আরো ভারাক্রান্ত হচ্ছে। বিভিন্ন ছবি প্রকাশের মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে উদ্ঘাটিত হচ্ছে কিভাবে বিভিন্ন বাজারের উপর বোমাবর্ষণ করা হয়েছে। যার ফলে অসহায় , প্রতিরক্ষাবিহীন চেচেন নারী , শিশু ও নিরস্ত্র বেসামরিক লোকজন --তারা বেঁচে থাকার কোন সুযোগই পায় নি। একটি মাত্র বোমা বর্ষণের ঘটনায় যা করা হয়েছিল মা ও শিশু সদনে , তাতে পনেরো জন বাচ্চা মারা যায়। রুশ নেতারা হুকুম দিয়েছিল সৈন্যরা যেন বেসামরিক মানুষদেরকেও গুলি করে। ফলে চেচেনের সাধারণ লোকজন তাদের গ্রাম থেকে পালিয়ে পাশের দেশগুলিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। রুশ নেতাদের এই ধরনের হুকুমের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসের বহুমুখী মাত্রার পরিচয় প্রকাশ পায়। অতীতে ফেরাউন তার নিজের দেশের মানুষদের বিরুদ্ধে এই জাতীয় নৃশংস হত্যাকান্ড চালিয়েছিল। কুরআনে এর বিশদ বিবরণ এসেছে – “ আর স্মরণ করো , যখন আমি তোমাদের মুক্তি দিয়েছিলাম ফেরআউনের লোকদের হাত থেকে যারা তোমাদের কঠিন শাস্তি দিত ; তোমাদের পুত্র সন্তানদের জবাই করতো ও তোমাদের নারীদের জীবিত রেখে দিতো ; ওতে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক মহাপরীক্ষা ছিল” (সুরা বাকারা; ২: ৪৯)।

অতীতে সবসময় প্রতিরক্ষাবিহীন মানুষেরা ফেরাউনের মতো মানুষদের অত্যাচারের অসহায় শিকার হয়েছে। কুরআনে এই সব ঘটনায় দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা আরো ভালভাবে বুঝতে পারবো। কিভাবে চেচনিয়াতে সন্ত্রাস চলছে এবং চেচনিয়ার মানুষেরা সেখানে হুমকির মুখে রয়েছে। চেচনিয়াসহ ককেশাস এলাকা ১৯১৮ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার শাসনাধীনে ছিল। এ সময় কমিউনিস্ট মস্কো বিশাল এলাকা জুড়ে শাসন চালায় ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের

ভিত্তিতে কৃত্রিম সীমানা সৃষ্টি এলাকাগুলিকে ভাগ করে। বাধ্যতামুলক অবস্থান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জাতিগত বিভক্তি পরে আরো কঠোর করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কমিউনিস্ট শাসনের সময় গভীর রাতে অপারেশন চলতো এবং ককেশান মানুষদের বাধ্য করা হতো ট্রেনে চড়ে সাইবেরিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে চলে যেতো । হাজার হাজার মানুষ জীবিত অবস্থায় গন্তব্য স্থলে পৌঁছাতে পারে নি ও তাদের ছেড়ে যাওয়া জায়গায় কমিউনিস্ট শাসকদের আদেশে অন্য জাতিগত দল এসে বসবাস শুরু করে। কয়েক বছর পর যখন ককেশানরা ফিরে আসলো ,তখন তারা দেখলো তাদের ঘর-বাড়ি অন্য মানুষদের দখলে।

এখন আমরা যে জাতিগত দ্বন্দ্ব দেখি ,তা মস্কোর ‘ বিভক্তি ও শাসন ’ নীতির জন্যই বেশী খারাপ রুপ ধারণ করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী ও জাতিগত গোষ্ঠীর উচ্চাকাঙ্খার ঢাকনা খুলে দেয়। তারা সোভিয়েত শাসন থেকে মুক্তি পেতে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়। কিছু জাতিগত গোষ্ঠি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় কিন্তু রুশ ফেডারেশনের মানুষেরা Dzhokhar Dudayev এর নেতৃত্বে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের ঘোষণা দেয়। রুশ ও চেচেনদের ১৮ মাস দীর্ঘ লড়াই শেষ হয় ১৯৯৬ সালে। রুশ সৈন্যদেরকে প্রত্যাহার করে নেয়া হয় ও চেচেনরা স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়। ১৯৯৭ সালে মস্কো ও গ্রোজনীর মধ্যে সম্পাদিত শান্তি চুক্তির মধ্য দিয়ে এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে ও চেচনিয়ার স্বাধীনতার প্রাপ্তি ঘটে। পূর্ববর্তী একটি চুক্তির জন্য অবশ্য ২০০১ সাল পর্যন্ত চেচনিয়ার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা স্থগিত রাখতে রুশরা সক্ষম হয়। অন্যান্য প্রজাতন্ত্র অনুসরণ করে চেচনিয়ার মানুষদেরকে যারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে। ১৯৯৮ সালে চেচনিয়ার রাজধানী গ্রোজনীতে সমবেত হয় উত্তর ককেশাস কাউন্সিলের মানুষেরা। সভাতে এরা একমত হয় যে একে অন্যের সাথে যুদ্ধ করবে না। ১৯৯৯ সালের দ্বন্দ্বের মূলে রয়েছে এই সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি।

Dagestan হলো চেচেনদের প্রতিবেশী যার জনসংখ্যার ৮০% হলো মুসলিম। রুশ শক্তি এখানকার বিভিন্ন গ্রামে বোমা হামলা চালায় । এসব গ্রামের ১৫০০ বাসিন্দা চেচেনদের কাছে সাহায্য চায়। ১৯৯৬ সালে রুশ ফেডারেশনের বিরুদ্ধে চেচেনদের বিরাট সাফল্যের জন্যই মুলত: এরা চেচেনদের কাছে সাহায্য চায়। একজন চেচেন বীর Shamil Basayev এই সাহায্যের আবেদনে সাড়া দেয়। ১৯৯৯ সালে সালের গ্রীস্মকালে প্রচন্ড বোমা বর্ষণে Dagestan এর গ্রামগুলি ধ্বংস হয়ে যায় ও মাত্র দুইজন মানুষ বেচেঁ থাকে। এই অপারেশনের পরিণাম হলো রুশ ও চেচেনদের মধ্যে নতুন করে যুদ্ধ। চেচেনদের উপর রুশদের নির্মম গণহত্যার পেছনে নানারকম স্বার্থ রয়েছে। এতে কিছুই যায় আসে না যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে কী ব্যাখ্যা দেয়া হলো---- সবসময়ই নারী , শিশু ও দরিদ্ররা যুদ্ধের কারণে কষ্ট পায় সবচেয়ে বেশী। বেঁচে থাকার

জন্য এদেরকে লড়াই করতে হয় অভাব , ক্ষুধা ও মহামারীর বিরুদ্ধে । চেচনিয়াতে রুশদের প্রধান আকাঙ্খা ছিল ঘর-বাড়ি থেকে চেচেনদের তাড়িয়ে দেয়া ; তাদের অস্তিত্ব বিলীন করা ও চেচেনদের জায়গা-জমি অন্য জাতি-গোষ্ঠীর জন্য উন্মুক্ত করা। তাই অসহায় , নিরস্ত্র ও প্রতিরক্ষাহীন মানুষদের নির্মমভাবে গণহারে মেরে ফেলা হয়। আরো দু:খজনক হলো , চোখের সামনে এই পৈশাচিক কান্ড ঘটার পরেও পুরো পৃথিবী ছিল নির্বিকার।

কাশ্মীরের অরক্ষিত মানুষেরা:

কাশ্মীর একটি বিপদসংকুল এলাকা , যেখানে সবসময় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের কারণে সন্ত্রাস চলতেই থাকে। কাশ্মীরে অতীতে নিরপরাধ বেসামরিক মানুষেরা প্রচন্ড দু:খ-কষ্ট -ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে। ভারত দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশদের শাসনে ছিল। ভারত থেকে ব্রিটিশদের চলে যাওয়ার সময় ভারতীয় মুসলমানরা একটি আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করে। পাক-ভারতের মধ্যে মানুষ বদলা-বদলী হয়। ভারত থেকে বহু মুসলমান পাকিস্তান চলে যায়। অবশ্য , জম্মু ও কাশ্মীর মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ার পরেও দিল্লীর চেষ্টা ও ব্রিটিশদের সমর্থনের কারণে ভারতের অধীনেই থেকে যায়। [অনুবাদকের সংযোজন: অনেক কাশ্মিরী মুসলমান ভারতের সাথে এক হওয়াকে মেনে নিতে চায় নি , এদের অনেকে
পাকিস্তানের সাথে এক হতে চায় , কেউ বা স্ব-শাসন চায় ।] তখন থেকে শুরু করে আজ অবধি কাশ্মীরে উত্তেজনা কখনোই থামে নি।

ভারত কাশ্মিরী মুসলিমদের উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করে ; এমন কী , বেসামরিক মানুষদের উপর রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে , ১৯৪৭ , ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালে সংঘর্ষ বেড়ে যাওয়ায় হাজার হাজার কাশ্মিরী মুসলমান মারা যায়। মৃত্যুর প্রকৃতি ছিল ভয়াবহ-- বৃদ্ধ , অসুস্থ , ছোট্ট শিশু ----কেউ-ই মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পায় নি। বহু নারী ধর্ষিতা হয় । নির্মম গণহত্যা ও কাশ্মিরীদেরকে ভারতের সাথে একীভূত করার নীতি আজো চলছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে , নির্যাতনের ফলে কাশ্মিরে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। হাজারো মানুষ শারীরিকভাবে চিরতরে পঙ্গু হয়। ভারতীয়রা মুসলমানদের ঘর-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় আর ইসলামী

স্কুল ও পত্র-পত্রিকা বন্ধ করে দেয়। কাশ্মিরীদের যন্ত্রণার এখনো শেষ হয় নি। অসংখ্য মানুষ এখন গুহার মত আশ্রয়স্থলে খুব কঠিন অবস্থার মধ্যে বাস করছে। অনেকেই হয়তো ভাবে , হাজার হাজার মাইল দুরের বিশ্বের অন্য এক এলাকার মানুষের জন্য তাদের কিছুই করার নেই। এই চিন্তা অত্যন্ত অমানবিক ---কুরআনের শিক্ষা থেকে অনেক অনেক দুরে। আগেই বলা হয়েছে , একজন বিশ্বাসীর দায়িত্ব হলো ধর্মের বাণী সবার কাছে পৌঁছে দেয়া। ধর্মের কথা পৌঁছাতে হবে হয় নিজের পরিবারের সদস্যদের কাছে অথবা বিশ্বের অন্য কোন প্রান্তের মানুষের কাছে। বাস্তুহারা কাশ্মিরীদের আশ্রয় শিবির পরিদর্শন করে একজন সাংবাদিক যে প্রতিবেদন লিখেছেন , সেটা থেকে কিছু লাইন নীচে দেয়া হলো। কারো বিবেককে নাড়া দিতে শুধুমাত্র নীচের বর্ণনাই যথেষ্ট । আশ্রয় শিবিরের নিদারুণ কষ্টের জীবনচিত্র এই প্রতিবেদনে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীর থেকে পালিয়ে আসা কাশ্মিরীদের জন্য ১৯৯০ সালে আম্বরে আশ্রয় শিবির খোলা হয়। জীবন যাপনের মান একেবারে শোচনীয় এখানে। কাদামাটির ছোট্ট ঘরগুলিতে মানুষজন বোঝাই হয়ে আছে। একটি ছোট ঘরে ঢুকলাম আমরা , সেখানে মাত্র একটি বিছানা। জানতে চাইলাম , এই এক কামরায় কয়জন থাকে ? উত্তর এলো , নয়জন। ঐ উদ্বাস্তু শিবিরে ২১৪ টি পরিবার ছিল। সদস্য সংখ্যা ছিল ১০১০।

ঐ একটি মাত্র কাদামাটির ঘরই এখানকার দু:খময় জীবনের যথার্থ ছবি আমাদের বুঝিয়ে দিল। সাধারণত এসব ঘরে দুইটি কামরা থাকে। কিছু সেকেলে তৈজসপত্র , একটি অথবা দুইটি বিছানা---যদি সত্যিই এগুলিকে বিছানা বলা যায়। একজন মা হাঁটু গেড়ে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে এক কোণায় বসেছিলেন। আমি দেখলাম , শুকনো কয়েকটি লাকড়ি দিয়ে জ্বালানো আগুনের উপর একটি পাত্র রাখা আছে ; কিন্তু আশেপাশে তাকিয়ে খাবার কোন জিনিষই দেখলাম না। পাত্রের ঢাকনা খুলে ভিতরে সত্যি-ই খাবার কিছু রান্না হচ্ছে কী না , তা দেখার সাহস আমার হলো না।

বেশ কিছু তাবুতে আমি দেখেছি সেখানে না আছে খাবার , না আছে ঘুমানোর কোন ব্যবস্থা। একটি তাবুর মাঝখানে পুরানো একটি চাদর বিছানো ছিল। মনে হয় , এটাকেই বিছানা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যখন জানতে চাইলাম , এই তাবুতে কয়জন থাকে ? উত্তর আসলো , এগারো (১১)। ঐ তাবুর বাইরে শুধু একটি রান্নার পাত্র দেখলাম।

কসোভোতে জাতিগত হত্যাযজ্ঞ:

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কসোভো ১৯১২ সালের বলকান যুদ্ধের আগ পর্যন্ত অটোমান শাসনে ছিল। আজো কসোভোর জনগণ অটোমান সাম্রাজ্য ও শাসনের ঐতিহ্য অনুসারে মুসলমান। বিশ্বে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটলে বিশ্বে বিশেষ করে বলকান অচঞ্চলে সীমান্ত ও এলাকা বদলের একটি যুগ শুরু হয়। অটোমান ঐতিহ্যের বংশধররা এই পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। বসনিয়া ও কসোভোতে আজ যা ঘটছে , তা ঐ ঐতিহাসিক ঘটনার পরিণাম। অটোমান সাম্রাজ্য ঐ এলাকায় একটি ভারসাম্য বজায় রেখেঠিল। এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে সেখানে ভারসাম্যহীনতা ও বিভেদের সৃষ্টি হয়। বিশ্বযুদ্ধগুলির পর নতুন যে সব রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটে , তা ঐ বিভেদ দুর করতে পারে নি। এই এলাকায় যে দ্বন্দ্ব –সংঘর্ষ এখন দেখা যায় , তা ঐ বিভেদের ফল।

বসনিয়ায় দীর্ঘ তিন বছরের অমানবিক গণহত্যা:

বসনিয়ার মুসলমানদের উপর দীর্ঘ তিন বছর ধরে অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয় । পৃথিবী জুড়ে মানুষ কিভাবে অত্যাচারের শিকার হয়ে নির্যাতিত হচ্ছে , বসনিয়ার গণহত্যা তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। ১৯৯২ সালের এপ্রিলে সার্বরা যে যুদ্ধ শুরু করে তার উদ্দেশ্য ছিল---হয় কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মুসলমানদেরকে নির্মূল করা অথবা তাদেরকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা। অবশ্য বসনীয় মুসলিম বাহিনী অপ্রত্যাশিত প্রতিরোধ গড়ে তুলে। এই যুদ্ধ ১৯৯৫ সালের বসন্তকাল পর্যন্ত চলে। যুদ্ধের এই পুরো সময়টাতে যে সন্ত্রাস চলে , তা বিশ্বের ইতিহাসে নজিরবিহীন। সার্বরা দুই লক্ষেরও বেশী বসনীয় মুসলমানকে হত্যা করে ও বিশ লক্ষ মুসলমানকে বাধ্য করে ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে। ৫০ হাজারের বেশী মুসলমান নারীকে ধর্ষণ করা হয়। সার্বদের বন্দী শিবিরে মুসলমানদের উপর অসহনীয় অত্যাচার চলে ---হাজার হাজার মানুষ চিরতরে পঙ্গু হয়ে যায়। সবচেয়ে অবাক করা ব্যপার হলো , সার্বদের প্রচন্ড রোষের মুখে পড়ে যে বসনীয়রা নির্মমভাবে অত্যাচারিত হয় , তারা উভয়েই একই জাতি ও একই ভাষা-ভাষী। একমাত্র পার্থক্য হলো ধর্মের। অন্যভাবে বলা যায় , বসনিয়া ও কসোভোতে যা হয়েছে তা ধর্মযুদ্ধ। ইসলামের বিরুদ্ধে অর্থোডক্স গির্জার চিরস্থায়ী ঘৃণার কারণেই এই যুদ্ধ শুরু হয়।

বৃহত্তম ইসলামিক দেশে ধর্মবিরোধী স্বৈরতন্ত্র:

ইন্দোনেশিয়াতে একজন মুসলমানের প্রাণ ঠিক ততটাই অনিশ্চিত ও বিপজ্জনক , যেমনটি দুর প্রাচ্যের সমুদ্রের বুকের কোন দ্বীপবাসীর প্রাণ রয়েছে ঝুঁকির মুখে। এর কারণ , পুরো পৃথিবী জুড়েই অসংখ্য মানুষ যুদ্ধের মুখোমুখি। ইন্দোনেশিয়া বিশাল এলাকা জুড়ে প্রতিষ্ঠিত ---ইউরোপের সীমানার সমান আয়তন ; বিশ্বের চতুর্থ জনসংখ্যার দেশ এটি। এর লোকসংখ্যা ২১০ মিলিয়ন (মধ্য ২০০০ সালে)। মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ৮৭% । মুসলমান সম্প্রদায় ছাড়াও ৩০০ জাতিগত গোষ্ঠি রয়েছে এখানে। সর্ববৃহৎ মুসলিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও সবসময়ই মুসলমানরা ইন্দোনেশিয়াতে নির্মম অত্যাচারের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছে। এটি একটি সাবেক ডাচ উপনিবেশিক এলাকা। এই দেশের শাসন ক্ষমতা সবসময়ই ছিল জাভ্যানিজ বংশোদ্ভুতদের হাতে। এরা জনসংখ্যার মাত্র ৭%। ক্ষমতা দখলের পর এই জাভ্যানিজ বুদ্ধিজীবি ও শাসকশ্রেণী ক্ষমতা সম্পুর্ণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার সংগ্রাম চালায় ও সর্বাত্নক চেষ্টা চালায় ইন্দোনেশীয় তথা জাভ্যানিজ জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করতে ----যদিও এটি একটি বহু জাতির দেশ। এর প্রতিবাদে আচেহ-সুমাত্রার মুসলমানদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন আসে ১৯৫৩ সালে। তারা স্বাধীনতার ডাক দেয়। শাসকগোষ্ঠী তখন মুসলমানদেরকে বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দেয় এবং তাদের উপর নির্মম গণহত্যা চালায়।

১৯৬৮ সালে মার্কিন সমর্থনপুষ্ট সুহার্তো দেশের রাষ্ট্রপতি হোন এবং Amnesty International এর প্রতিবেদন অনুযায়ী তার আমলে ১০ লক্ষ মানুষকে নির্মমভাবে খুন করা হয়। ১৯৯৮ সালে সুহার্তো সপ্তমবারের মতো দেশের রাষ্ট্রপতি হোন । এই সময়ের মধ্যে দেশের সর্বত্র দুর্নীতি মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ে। এর জন্য দায়ী ছিল সুহার্তোর চরম স্বজনপ্রীতি। একনায়কতন্ত্র ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা জনগণকে আগে থেকেই অনেক যন্ত্রণার মধ্যে রেখেছিল। জনগণের বিশ্বাসের সাথে সর্বশেষ বিশ্বাসঘাতকতা দেশের মধ্যে দাঙ্গাকে উসকে দেয়। ভোগ্য পণ্যের দাম যখন ১০০% বেড়ে গেল , তখন জাকার্তার রাস্তায় রাস্তায় ক্রুদ্ধ জনতার ক্ষোভের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। সেনা প্রশাসন বন্দুক চালিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করতে চেষ্টা করে ও হাজারো মানুষকে হত্যা করে। অথচ মানুষের দাবী ছিল খুব সাধারণ---- জীবনযাত্রার মান ভাল করা এবং নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়া। সুহার্তোর পতনের পরেও ইন্দোনেশিয়াতে অবস্থার উন্নতি হয় নি বা শান্তি-শৃঙ্খলা পুন:প্রতিষ্ঠিত হয় নি। পরবর্তী বেশ কয়েকজন শাসকদের আমলেও দেশের দ্বন্দ্ব-সংঘাত বন্ধ করা যায় নি।

এই বইতে বারবার যা বলা হয়েছে , সেই কুরআন ও সুন্নাহ'র আদর্শই কেবল পারে সেই সুশাসন নিশ্চিত করতে যা পক্ষপাতহীন , সন্ত্রাসহীন ও আইন-শৃঙ্খলাহীন । এর কারন , কুরআনের আদর্শে গড়া জীবন অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা , সংঘাতপুর্ণ

মতবাদের জন্য বিরোধীতা , অবিচার ও সন্ত্রাস দুর করে। এই সমস্যাগুলি না থাকলে সমাজে এমন পরিবেশের সৃষ্টি হবে , যেখানে কেউ নিষ্ঠুরতার মুখোমুখি হবে না।

এমন এক মুসলমান সম্প্রদায় যার সাথে পুরো বিশ্বের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে : পূর্বাঞ্চলীয় তুর্কীস্থানের Uigur Turks :

নানা কারনে পূর্বাঞ্চলীয় তুর্কীস্থান স্বল্প পরিচিত একটি দেশ। এটি তুর্কীর দ্বিগুণ আয়তনের। শুধুমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাস পালন করতে চাওয়ায় এখানে মুসলমানদের উপর যে মানবিক অধিকার লঙ্ঘনের নির্মম অত্যাচার চীনা কমিউনিস্ট শাসকরা চালাচ্ছে , সে সম্পর্কে পুরো বিশ্ব কিছুই জানে না। তুর্কী মুসলিমদের নিজেদের এলাকা ত্যাগের বা দেশের মূল ভূ-খন্ডে প্রবেশের অধিকার সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত। মুসলিম সম্প্রদায় হলো Uigurs বংশোদ্ভুত (এই তুর্কীভাষী এশীয়ানরা আগে অন্য ধর্মের ছিল , পরে ইসলাম কবুল করে)। চীনারা এই এলাকাকে বলে Xinjiang প্রদেশ। সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী মুসলিম প্রধান এই প্রদেশের জনসংখ্যা ২০-৩০ মিলিয়ন যদিও সঠিক পরিসংখ্যান এটি নয় । মুসলমানরা মনে করে চীনারা ইচ্ছা করে এই সংখ্যা কমিয়ে বলে ; মুসলিমদের প্রকৃত সংখ্যা চীনা পরিসংখ্যানে যা বলা হয় তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী।

চীন কেন পূর্বাঞ্চলীয় তুর্কীস্থানের প্রতি এত গুরুত্ব দেয় ? এই এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদের হিসাবই বুঝিয়ে দেয় কারনটা। বিশাল তেল সম্পদের উপস্থিতি হলো চীনের প্রধান স্বার্থ।

সাম্প্রতিক জরীপে প্রকাশ এখানে আরো তেল সম্পদ মজুদ আছে। চীনা সরকারী সূত্রে নিশ্চিত করা হয়েছে , ২০-৪০ বিলিয়ন টন তেল সম্পদ মজুদ আছে এখানে। বিদেশী কিছু তেল কোম্পানী দাবী করেছে , এই তেল সম্পদ এতটাই সমৃদ্ধ যে এটা সৌদী আরবের তেল সম্পদের সমান। পূর্বাঞ্চলীয় তুর্কীস্থান ২৫০ বছর ধরে চীনা শাসনের অধীন । চীনারা কখনো এই এলাকার মানুষের স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করে নি ও সবসময়ই এই দাবীকে অত্যাচার - নির্যাতন দিয়ে দমন করেছে । চীনারা শুধু এটুকু স্বীকৃতি দেয় যে , এই মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা মূল ভূ-খন্ড সংশ্লিষ্ট একটি প্রদেশ।

১৯৪৯ সালে মাও ক্ষমতা দখল করলে তুর্কীস্থানের উপর দমন নীতি আরো বেড়ে যায়। যে সব মুসলমান এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করে , তাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে মেরে ফেলা হয় ও তাদের আইন স্বীকৃত দাবীকে প্রত্যাখান করা হয়। ১৯৪৯ সাল থেকে

এখন পর্যন্ত আনুমানিক ৩৫ মিলিয়ন মানুষকে খুন করা হয়েছে। যারা বেঁচে থাকলো তাদের উপর অত্যাচার , সব ধরনের সন্ত্রাস ,ভয়াবহ নির্যাতনমুলক দমননীতি প্রতিদিন চলছে। অনেক মানুষকে জীবন্ত কবর দেয়া হলো , মেয়েদেরকে ধর্ষণ করা হলো । ১৯৫৩ সালে এই এলাকায় মুসলমান ছিল জনসংখ্যার ৭৫% ও চীনারা ছিল মাত্র ৬%। ১৯৯০ সালে এই চিত্র বদলে চীনাদের পক্ষে যায়। চীনা জনসংখ্যা ৫৩% ও মুসলমানদের হার কমে হয় ৪০%। এই সংখ্যাই বলে দেয় এই অঞ্চলে মুসলমানদের উপর কতভাবেই না গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। পূর্বাঞ্চলীয় তুর্কীস্থানে মানুষ যে অত্যাচারের মধ্য দিয়ে গিয়েছে , তা বসনিয়া ও কসোভোতে যা ঘটেছে তার থেকে খুব একটা আলাদা নয়। একটাই পার্থক্য হলো পূর্বাঞ্চলীয় তুর্কীস্থানের সাথে পুরো বিশ্বের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। তাই এই এলাকা সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া খুব মুশকিল।

চীন খুব সাফল্যের সাথে উদ্যোগ নিয়েছে , যাতে পূর্বাঞ্চলীয় তুর্কীস্থানে যে অত্যাচার হয়েছে , তা প্রকাশ না পায়। এজন্য এমন কী ইন্টারনেটকেও কঠোর নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। এই এলাকার নিরপরাধ ও অরক্ষিত মানুষ কী নির্মম অত্যাচারের মধ্য দিয়ে জীবন কাটায় , সে ব্যাপারে পুরো বিশ্ব সম্পূর্ণ অন্ধ ও নির্বিকার। তারা মনে করে , এটা চীনের নিজেদের সমস্যা। পূর্বাঞ্চলীয় তুর্কীস্থানে যে গণহত্যা ঘটেছে , তাতে প্রমাণ হয় যে ধর্মহীনতা যে দেশে আছে যেমন চীন , সেখানে মানুষের প্রাণের মূল্য কত তুচ্ছ। ধর্মহীনতার প্রভাবে মানুষ মনে করে , মতের মিল না হলে তারা কেন অন্য মানুষকে খুন করবে না অথবা তাদের উপর কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অত্যাচার চালাবে না ?

চাঁদ: মরুদ্যানে ঘেরা একটি দরিদ্র দেশ।

মুসলিম অধ্যুষিত এই দেশটি স্বাধীনতা লাভ করার পর খৃস্টানরা এই দেশের ক্ষমতায় বসে। মন্ত্রণালয়গুলি সমানভাবে মুসলমান ও খৃস্টানদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয় যদিও মুসলমানদের সংখ্যা ছিল দুই মিলিয়ন (২০ লক্ষ) ও খৃস্টান ছিল মাত্র ৮০,০০০ । খৃস্টান শাসকদের সাথে সাবেক উপনিবেশ শাসকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মুসলমানদের সাথে খৃস্টান শাসকদের সংঘর্ষ শুরু হয় যখন ইসরাইলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। প্যালেস্টাইনে যা ঘটছে ,তার প্রেক্ষিতে মুসলমানদের জন্য স্বভাবতই এই বিষয়টি ছিল অত্যন্ত স্পর্শকাতর। ইসরাইলের সাথে রাজনৈতিক জোট গঠণ করা মানে প্যালেস্টাইনের মানুষদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা। সরকারে যে সব মুসলমান

ছিল তারা ইসরাইলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। ফলে সরকারে তাদের অবস্থান হারাতে হয়। একদিন সকালে তারা সবাই সরকার থেকে উৎখাত হয়। অনেককে গ্রেফতার ও বন্দী করা হলো এবং তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এসব ঘটনাবলী মুসলমানদের উপর দমন নীতি চালানোর যুগ শুরু করে। মুসলমানদের একটি ব্যর্থ বিদ্রোহের পর কমপক্ষে এক হাজার মানুষ মারা যায় ও হাজারো মানুষ আহত হয়।

ফিলিপাইন:

ফিলিপাইন বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মার্কিন শাসনাধীনে আসে ও ১৯৪৬ সালে স্বাধীন হয়। মার্কিনীরা দ্বীপটি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর যারা এতদিন মার্কিনীদের অনুগত ছিল ও মার্কিনীদের স্বার্থে কাজ করতো তারা ক্ষমতায় আসে এবং মুসলিমরা তাদের শাসনাধীনে আসে। দ্বীপে নিজেদের ক্ষমতা দৃঢ় করতে শাসকরা মুসলমানদের জমি বাজেয়াপ্ত করার নীতি গ্রহণ করে। এই নীতি বাস্তবায়নে জমি বরাদ্দ সংক্রান্ত নতুন আইন জারী করা হয়। তাহলো , একজন অমুসলিম ফিলিপিনো যেটুকু জমির মালিক হতে পারবে , একজন মুসলিম পাবে তার মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ। এর ফলে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় ৩.৫ মিলিয়ন (৩৫ লাখ) ফিলিপিনো এসে বসতি স্থাপন করে ও মুসলিম-ফিলিপিনোদের মধ্যে সংঘর্ষের আগুন জ্বালায়। নিজেদের অধিকার রক্ষায় মুসলমানরা চেষ্টা করে দেশের রাষ্ট্রপতি ফার্ডিন্যান্ড মার্কোসের সাথে সমঝোতায় আসতে কিন্তু তাতে তারা ব্যর্থ হয়। মার্কোসের শাসন নীতি চেষ্টা চালায় মুসলমানরা যাতে স্বকীয়তা ভুলে ফিলিপিনোদের সাথে পুরোপুরি একীভূত হয়ে যায়।

বেতন বাড়িয়ে ও পছন্দের মানুষদের পদোন্নতি দিয়ে মার্কোস সশস্ত্রবাহিনীকে নিজের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক যন্ত্রে পরিণত করেন এবং সাংবিধানিক আইন স্থগিত করে সামরিক আইন জারী করা হয়।

মুসলমানদের পক্ষে দি মোরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (এম এন এল এফ) যুদ্ধ করে এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ৫০ হাজারের বেশী মুসলমান মারা যায় । এদের মধ্যে বেশীরভাগই ছিল বেসামরিক , নিরস্ত্র লোক। হাজারো নারী , শিশু , বৃদ্ধ খুন হয়। মুসলমানদেরকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করতে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাহিনীকে কাজে লাগানো হয়। এরা ছিল হিংস্র ধরনের গেরিলা বাহিনী যারা চূড়ান্তভাবে মানুষকে নির্যাতন করতো যেমন নির্যাতিত ব্যক্তির মাথার খুলি ফাটিয়ে দেয়া , তার রক্ত পান করা ইত্যাদি। অত্যাচার করার জন্য প্রত্যেক বন্দীর জন্য তারা বিশেষ কৌশল প্রয়োগ করতো । মুসলমানদেরকে খুন করে তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতো। মার্কোসের পর যিনি ক্ষমতায় আসেন , তিনিও সেই একই নিষ্ঠুর নীতি অনুসরণ করেন এবং একইভাবে জাতিগত হত্যা চালিয়ে যান।

লেবানন:

পৃথিবী জুড়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ মুসলিম দেশগুলিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। সব রক্তাক্ত সংঘর্ষের মধ্যে ইয়াহুদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইনীদের প্রতিরোধই সবচেয়ে বেশীদিন ধরে চলছে। এই আগ্রাসন চালায় ইয়াহুদীরা এবং পশ্চিমা দেশগুলি সবসময়ই একে সমর্থন দিয়ে এসেছে । এই আগ্রাসনের ফল হলো হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু , উদ্বাস্তু হওয়া এবং এক রক্তাক্ত ইতিহাস।
ইসরাইলী আগ্রাসনের পুরো সময়টা জুড়ে বেসামরিক মানুষদের যে কষ্ট ও যন্ত্রণা , তার প্রতিফলন সংষর্ঘ , যুদ্ধ ও গণহত্যার মধ্যে সামান্যই প্রতিফলিত হয়েছে।
১৯৫০ সালের পর ইসরাইলীরা প্রতিবেশী দেশ লেবাননে বেশ কয়েকবার হস্তক্ষেপ করে। তারা লেবানের বেশ কিছু দলের মধ্যে সংঘর্ষের আগুন জ্বালিয়ে দেয় , গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়া এই দলগুলি ইসরাইলের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখে ও তাদের থেকে সাহায্য পায়। এই সংঘর্ষগুলির ফলে লেবাননে ক্ষমতার ভারসাম্য দুর্বল হয়ে পড়ে । ফলে এদেশে অবৈধ অভিযান চালানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়। ইসরাইল বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী যেমন মেরোনাইট , খৃস্টান , গ্রীক অর্থোডক্স খৃস্টান , শিয়া মুসলিম , সুন্নী ও দ্রুজদের উত্তেজিত করে তোলে এবং ধীরে ধীরে ‘ বিভেদ ও শাসন ’ নীতির সুফল ইসরাইল ভোগ করতে থাকে। দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে ইসরাইল যে পরিকল্পনা মাফিক অগ্রসর হয় , তার সমাপ্তি ঘটে ১৯৮২ সালে লেবাননে সত্যিকারের সামরিক অভিযান চালিয়ে। গৃহযুদ্ধের ফলে বৈরুত এলাকা বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাগ হয়ে পড়ে । মজার ব্যপার হলো , প্রত্যেক দলই ইসরাইল থেকে সমর্থন ও অস্ত্র পায়। বিশেষ করে যারা ক্ষমতা দখল করে সেই ফালাঞ্জি খৃস্টান বাহিনীর সাথে ইসরাইলের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

জর্ডান থেকে রাজা হোসেন যে প্যালেস্টাইনীদের জোর করে বের করে দেন , তারা লেবাননে এসে থাকতে শুরু করে । তখনই দৃশ্য:ত লেবাননে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। লেবানন থেকে এই প্যালেস্টাইনীদের বের করে দেয়ার জন্য খৃস্টানরা সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করে দেয়। মুসলমান ও খৃস্টান এই যুদ্ধে একে অন্যের প্রতিপক্ষ ছিল এবং এই সংঘর্ষে আভ্যন্তরীনভাবে দুই দলই সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছিলো। এই যুদ্ধের সময় ইসরাইল লেবাননের সীমানা অতিক্রম করতে শুরু করে। একই সময় , লেবাননের বিরুদ্ধে মার্কিন ও ইসরাইলী সমর্থনপুষ্ট সিরিয়া -- যে দৃশ্যত: মুসলিম একটি দেশ

তাদের হামলার ফলে লেবাননের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। খৃস্টান ফালাঞ্জি বাহিনী ইসরাইলের সহায়তায় রাজনৈতিক ক্ষমতা সুসংহত করে ও তা রক্তাক্ত এক যুদ্ধের সূচনা করে যা বৈরুতকে ধ্বংস করে ফেলে। ফিলিস্তিন ও লেবানিজ মুসলমানরা প্রচন্ড চাপের মুখে পড়ে। ১৯৭৮ সালের হামলার ধারাবাহিকতাতেই মূলত: ইসরাইল ১৯৮২ সালে লেবাননে অভিযান পরিচালনা করে। লেবানন যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ক্ষতবিক্ষত এক দেশে পরিণত হয়। এই সময় ইসরাইলী বাহিনীর উস্কানী ও তত্ত্বাবধানে লেবাননের খ্রীস্টান ফালাঞ্জি বাহিনী শাবরা ও শাতিলায় ফিলিস্তিনী বেসামরিক উদ্বাস্তুদের উপর নিষ্ঠুর , নির্মম গণহত্যা চালায়--ইতিহাস এই বর্বরতার সাক্ষী ।

"চরম ধর্মীয় উগ্রতা " : জাতিগত বিদ্বেষ:

" কাফিররা তাদের অন্তরে মূর্খতা যুগের জেদ পোষন করতো। অত:পর আল্লাহ তাঁর রাসুল ও মুমিনদের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদের জন্য সংযমের দায়িত্ব অপরিহার্য করে দিলেন। তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ সব বিষয় সম্পর্কে জানেন (সুরা আল ফাতহ্ ; ৪৮: ২৬)।

পুরো পৃথিবীতে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও গৃহযুদ্ধ চলছে ,তার জন্য দায়ী জাতিগত বিদ্বেষ। অন্য ধর্ম , বর্ণ , জাতির প্রতি প্রচন্ড ঘৃণা ও রাগের বহি:প্রকাশের দরুণ আমরা দেখি কালোদের প্রতি সাদাদের আগ্রাসী আচরণ , নাৎসীদের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতম জাতি পাওয়ার স্বপ্ন। যার পরিণামে সাম্প্রতিক ইতিহাসে আমরা দেখি লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু। আফ্রিকায় জাতি-দলের মধ্যে সংঘর্ষের মূলেও কাজ করে এই বিদ্বেষ। এই ভুল ধারণা মানুষের মনে কাজ করে যে যে নির্দিষ্ট একটি জাতি হয় শারীরিকভাবে বা মানসিকভাবে অথবা দুইভাবেই অন্যদের থেকে সেরা , তাই যারা শ্রেষ্ঠ তারা নীচু জাতির মানুষদের প্রতি কোনরকম ক্ষমা , সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা দেখাবে না-----তার কোনও দরকার নেই। এই একই যুক্তিতে কিছু উগ্রবাদী মনে করে এমন কী , নীচু জাতির মানুষদের সাথে একসাথে বাস করাও ভুল। এটা খুবই হিংস্র মানসিকতা ; কেননা , এই চিন্তা মানুষকে এমন ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে যে অন্য জাতির আর বেঁচে থাকারই দরকার নেই। তাই আমাদের থেকে যারা আলাদা তাদেরকে অতি অবশ্যই মেরে ফেলতে হবে।

আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেছেন , " বিভিন্ন জাতি সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে একে অন্যকে জানতে পারে ''। বিভিন্ন জাতি , বর্ণ, গোষ্ঠী ও ভাষার মধ্যে বৈচিত্র্য তা আল্লাহ'র এক অনন্য সৃষ্টি বৈশিষ্ট্য। কোন মানুষ যদি অন্য মানুষকে এজন্য অপছন্দ করে যে সে বেঁটে অথবা কালো , তবে তা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। আল্লাহ'র এই

সৃষ্টি বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে অশেষ সৌন্দর্য্য , অনেক উদ্দেশ্য ও অতি সুক্ষ রহস্য। একজন বিশ্বাসী খুব ভালভাবেই জানে যে ভাল হওয়ার মানদন্ড হচ্ছে আল্লাহ ভীরুতা। কুরআনের নীচের আয়াতে এই বিষয়টি স্পষ্ট ---" হে মানুষ ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী থেকে এবং তোমাদেরকে পরিণত করেছি বিভিন্ন জাতিতে ও বিভিন্ন গোত্রে , যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহ'র কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মর্যাদাবান সেই ব্যক্তি , যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মুত্তাকী । নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু জানেন , সব কিছুর খবর রাখেন " (সুরা হুজুরাত ; ৪৯:১৩)।

বিভিন্ন জাতিগত বিদ্বেষ ও ভুল বোঝাবোঝির মূলে রয়েছে মিথ্যা এক তথাকথিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। এই সুস্পষ্ট বর্বরতা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে ; কেননা , বর্তমান যুগের বিভিন্ন ভুল মতবাদ এই মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মিথ্যা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হলো ডারউইনের তথাকথিত বিবর্তনবাদ তত্ত্ব। অনেকে যারা বির্বতনের মতবাদ হিসাবে এটি শুনেছেন , তারা হয়তো ভাবছেন----এটি কেবলই জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু আসলে বির্বতনবাদ এর চেয়েও অনেক বেশী কিছু। এটি শুধুমাত্র জীববিজ্ঞানের তত্ত্ব নয় , এটি অনেক দর্শনতত্ত্বের ভিত যা অসংখ্য মানুষকে প্রভাবিত করছে।

বর্ণবিদ্বেষের মুলে রয়েছে মিথ্যা-বৈজ্ঞানিক এক তত্ত্ব: যখন ডারউইন প্রথম এই তত্ত্ব উপস্থাপন করেন , বিজ্ঞানীরা প্রথমে এটিকে গ্রহণ করেন নি। বিশেষ করে , জীবাশ্ম বিজ্ঞানীরা জানতেন যে , কল্পনার অলীক উদ্ভাবন থেকে এই মত তেমন বেশী কিছু নয়। তবুও ডারউইন বিজ্ঞানী মহলে প্রবেশের সুযোগ পান ; কেননা , ১৯ শতাব্দীতে যারা ক্ষমতায় ছিল , তাদের ক্ষমতায় থাকার আদর্শের সাথে এই মতের অপূর্ব মিল ছিল। ডারউইনের *The Origin of Species* বই প্রকাশের মধ্য দিয়ে বিবর্তনবাদের মত খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। একই সাথে ইউরোপীয়রা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মহাদেশ ও অন্যান্য সভ্যতাকে উপনিবেশের আওতায় আনতে থাকে। ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স ছিল অগ্রণী । তারা দখল করে দক্ষিণ-এশিয়ার কিছু অংশে ও ল্যাটিন আমেরিকার ও সামগ্রিকভাবে পুরো আফ্রিকা। উত্তর আমেরিকার স্থানীয় উপজাতিদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। সংক্ষেপে বলা যায় , ১৯ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পশ্চিমা সাম্রাজ্য বিশ্বের অন্য প্রান্তের বিভিন্ন সভ্যতাকে লুটপাট করে। তারা বিভিন্ন দেশের শাসন ক্ষমতা দখল করে নেয় , যাতে তাদের বিন্দুমাত্র অধিকার ছিল না।

ছলে-বলে -কৌশলে বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ তারা কব্জা করে নেয়। পশ্চিমারা মনে করলো , তাদের এসব অবৈধ কাজকে বৈধতা দেয়ার দরকার রয়েছে। ঠিক সেই সময়েই এই সব সাম্রাজ্যবাদীদেরকে ডারউইন একটি অপূর্ব সুযোগ এনে দেয়। তার এই তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মতবাদের সাহায্যে এটাই প্রতিষ্ঠিত করা হয় যে ----নির্যাতিতরা আসলে প্রকৃত মানুষের মর্যাদার অধিকারী নয় , তারা পশু শ্রেণীর। ১৮৭১ সালে প্রকাশিত *The Descent of Man* বইতে ডারউইন নিজের মত স্পষ্ট করে বলেন। এই বইয়ে ডারউইন জোর দিয়ে বলেন যে , বানর জাতীয় প্রাণী থেকে মানুষের উদ্ভব । শুধু তাই নয় , ডারউইনের মতে বর্তমানে যে বিভিন্ন মানব গোষ্ঠী রয়েছে ,তারা ' ক্রমবিবর্তনের ধাপে ' রয়েছে। ইউরোপীয়রা এদের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত এবং অনেক জাতির মানুষই এখনো দৃশ্যত: বানরের মতো। সব জীবিত প্রাণী এমন কী মানুষকেও ডারউইন চিহ্নিত করেছেন বেঁচে থাকার সংগ্রামে নিয়োজিত এক প্রাণী হিসাবে। তার মতে , প্রকৃতিতে এক তীব্র লড়াই সবসময় চলছে। যে শক্তিশালী সে সবসময়ই দুর্বলকে লড়াইতে হারিয়ে দিচ্ছে ; আর এভাবেই উন্নয়নের ধারা এগিয়ে চলছে। ডারউইন উল্লেখ করেন , 'বেঁচে থাকার লড়াই' মানুষের বেলাতেও সত্যি। এমন কী , তার The Origin of Species বইয়ের যে উপ-শিরোনাম , তাতেও তার বর্ণবিদ্বেষী মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে---- প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রজাতির উৎপত্তি অথবা জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ বিভিন্ন জাতির মধ্যে নির্বাচিত জাতিকে রক্ষা । ডারউইনের মতে , ইউরোপীয়রা হচ্ছে এই নির্বাচিত জাতি। আমেরিকার স্থানীয় মানুষ , আফ্রিকা ও অন্যান্য যে জাতি-গোষ্ঠি তারা বিবর্তনের উন্নয়নের ধারায় নেই----পড়ে রয়েছে সেই আদিম মানুষের যুগে। তার এই বিকৃত যুক্তির মত অনুযায়ী এই নীচু স্তরের মানুষদেরকে পোষ মানানো , বন্দী করা এমন কী মেরে ফেলাও বৈধ ---ঠিক যেমনটি বৈধ বানর বা অন্য প্রাণীর বেলায়। এই একই যুক্তিতে ডারউইন ভাবতো , অন্য জাতির মানুষদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যাবে। তার বইতে ডারউইন নীচু জাতির মানুষদের নিজেদের অধিকারভুক্ত করার পক্ষে যুক্তি দেন যে , অদুর ভবিষ্যতে যার খুব বেশী দেরী নেই , নি:সন্দেহে সভ্য জাতির মানুষেরা অসভ্য মানুষদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে ও অসভ্য মানুষদের বদলে এই পৃথিবীতে সভ্যরা নিজেদের জায়গা করে নেবে ....এতে কোনই সন্দেহ নেই যে এই নীচু জাতির মানুষেরা একদম নির্মূল হয়ে যাবে (Charles Darwin, *The*

Descent of Man, 2nd edition, New York, A L. Burt Co., 1874, p. 178)

এসব বিবৃতিতে প্রকাশ পাচ্ছে , ডারউইন স্পষ্টত:ই ছিলেন বর্ণ বিদ্বেষী। তার বিশ্বাস ছিল এই যে , ইউরোপীয়রা সব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; তাই অন্য জাতিকে দাস বানানো বা ধ্বংস করার অধিকার রয়েছে তাদের। বিবর্তনবাদের তত্ত্ব থেকে এই মত গ্রহণ করা হয় ; যা Social Darwinism নামে পরিচিত। এর উপর ভিত্তি করেই মূলত: সাম্রাজ্যবাদ , বর্ণবিদ্বেষ ও বৈষম্য বৈধতা লাভ করে। যে সব দেশে Social Darwinism কে সানন্দে গ্রহণ করা হয় , জার্মানী তার মধ্যে একটি।

নাৎসী ও ডারউইনিজম:

নাৎসীরা যে ডারউইনের বিবর্তনবাদ থেকে উৎসাহিত হয়েছিল , তা কোন আকস্মিক ঘটনাচক্র নয়। যেদিন থেকে এই মতের জন্ম হলো , নাৎসীদের আদর্শ থেকে তাকে কোনভাবেই আলাদা করার উপায় ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মানীতে নাৎসী মতবাদের জন্ম। জার্মানীর নাৎসী দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা এডলফ হিটলার ছিলেন এক উচ্চাকাঙ্খী ও আগ্রাসী ধরনের মানুষ। জীবনের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বর্ণবিদ্বেষমূলক। হিটলার মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতো যে জার্মানীরা প্রভু আর তারাই অন্য সব জাতিকে নেতৃত্ব দেবে। হিটলার নিজেকে নিবেদিত করে এমন একটি জার্মান সাম্রাজ্য (তৃতীয় রাইখ) প্রতিষ্ঠা করতে যা হাজার বছর ধরে বেঁচে থাকবে। ডারউইনের বিবর্তবাদ ছিল হিটলারের বর্ণবাদী মতবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। জার্মানীর একজন বর্ণবিদ্বেষী ইতিহাসবিদ Heinrich von Treitcshke দ্বারা হিটলার খুবই প্রভাবিত হন। ঐ ব্যক্তি আবার প্রভাবিত ছিল ডারউইন এর বিবর্তনবাদ মত দিয়ে। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে , ডারউইনের বেঁচে থাকার সংগ্রামের তত্ত্বের মতো বিভিন্ন দেশকেও তীব্র লড়াই করে উন্নতির প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে হবে। Treitcshke এর নীচের বক্তব্যের মধ্যে অন্যান্য জাতির প্রতি তার মনোভাবের প্রকাশ ঘটে----" শিল্পকলা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা বোঝার সাধ্য নেই এই মঙ্গোলীয় মানুষদের। কালোদের ভাগ্যই এটা যে , তারা সাদা মানুষদের সেবা করবে এবং অনন্তকাল সাদাদের ঘৃণার পাত্র হবে ...(টীকা ১৭: Alaeddin Şenel, Irk ve Irkçılık Düşüncesi (The Idea of Race and Racism), Ankara:Bilim ve Sanat Yayınları, 1993, pp.62-6)

ডারউইনের বিবর্তনবাদের সংগ্রাম থেকে হিটলার তার বিভিন্ন মত গঠনের প্রেরণা পায়। ডারউইনের বেঁচে থাকার লড়াই মতবাদ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে হিটলার তার বিখ্যাত বই *Mein Kampf লেখে।* অন্য জাতি সম্পর্কে ডারউইনের দৃষ্টিভঙ্গী হিটলার মেনে চলে এবং ঠিক তার মতোই অ-ইউরোপীয় জাতিদেরকে বানর জাতীয় প্রাণীর মতো বিবেচনা করে : নোর্ডিক জার্মান (লম্বা , সোনালী চুল , নীল চোখের ইউরোপীয়দের) বাদ দিলে থাকে শুধু বাঁদরের নাচ (টীকা ১৮: Carl Cohen, *Communism, Fascism and Democracy,* New York: Random House Publishing, 1972, p.408)

বিবর্তনবাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নাৎসীরা গ্রহণ করে সুপ্রজনন বিদ্যার মত। এটা ছিল " বিভিন্ন প্রজাতি (বিশেষত মানুষের) সংখ্যা নিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধি করা যাতে পছন্দমত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বংশ বৃদ্ধি হয়।'' এই মতের জন্য নাৎসীরা স্মরণীয় হয়ে আছে। পুরে ইউরোপে এই যেমন সুইডেনেও এই মত গৃহীত হয়। মনে করা হলো , এটা খুবই বড় একটা অর্জন হবে , যদি শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদেরকে শারীরিক মিলন থেকে দুরে রেখে তাদের বংশ বৃদ্ধি রোধ করা যায়----প্রয়োজনে বাধ্যতামূলকভাবে বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। এই মতের প্রবক্তা ছিলেন , হ্যাঁ , অনুমান করা সহজ যে এরা ডারউইনপন্থী।

এদের একজন লিওনার্দ ডারউইন ---চার্লস ডারউইনের ছেলে ; অন্যজন তার রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয় ফ্রান্সিস গেলটন। এই eugenics বা সুপ্রজননবিদ্যা মতবাদের প্রথম অনুসারী ও প্রচারক হলেন জার্মানীর বিখ্যাত বিবর্তনবাদী Earnet Hackel

ডারউইনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হেকেল তাকে নানা পথ ও মত বাতলে দিলো। এর একটা হলো প্রতিবন্ধী শিশুদের মেরে ফেলে বিবর্তনবাদের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা। আরেকটি মত ছিল ----- কুষ্ঠ , ক্যান্সার রোগী এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের বিনা যন্ত্রণায় মেরে ফেলা । নইলে এরা সমাজের বোঝা হয়ে থাকবে। হিটলার যখন ক্ষমতা গ্রহণ করলো , তখন হেকেলের এসব মতামত সরকারী বিভিন্ন নীতিতে গ্রহণ করা হলো । ফলে সাথে সাথে মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী , অন্ধ ও যারা বংশগত রোগে ভুগছে , তাদেরকে বিশেষ কেন্দ্রগুলিতে আটক রাখা হলো। এই বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে মনে করা হতো , এসব মানুষরা বিশুদ্ধ জার্মান রক্ত ও জাতিকে কলুষিত করছে ও তথাকথিত বিবর্তনবাদের ক্রম উন্নয়নের ধারাকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। সমাজ থেকে এসব বিশেষ শ্রেণীর মানুষদের সাময়িকভাবে আলাদা রেখে হিটলারের গোপন আদেশে অন্যায়ভাবে এদেরকে গোপনে মেরে ফেলা হয় । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর ' তৃতীয় রাইখ' এর স্থান হয়

ইতিহাসের পাতায়। কিন্তু পিছনে রেখে যায় লাখ , লাখ নিরপরাধ ভাগ্যাহত মানুষকে। এরপরও Social Darwinism
যা নাৎসী মতাদর্শের ভিত প্রতিষ্ঠা করে , তা এখনো রয়ে গিয়েছে। এতক্ষণ যে বিবরণ দেয়া হলো , তার সাথে অনেক মানুষই পরিচিত। অবশ্য খুব কমজনই বুঝে যে , এই ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া এখনো চলছে। শুধুমাত্র শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে নিরপরাধ মানুষকে সন্ত্রাস ও নিষ্ঠুরতার মধ্য দিয়ে হত্যার মাধ্যমে প্রকাশ পায় --যারা এটা করে , তারা কতটা অসুস্থ ও বিকৃত মন-মানসিকতার অধিকারী। ধর্মহীনতাই দায়ী এই অসুস্থ ও বিকৃত আত্মার জন্য। যতক্ষণ পর্যন্ত এই ধর্মহীনতার আদর্শ বজায় থাকবে , ততক্ষণ পর্যন্ত সব ধরনের অস্বাভাবিকতা , নিষ্ঠুরতা ও বিকৃত আচার-আচরণ চলতেই থাকবে। এই অসুস্থ মানসিকতার কিছু মানুষের জন্য লাখ লাখ মানুষ ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে---এটা ধর্মহীনতার একটি নিদর্শন।

যে মানুষ আল্লাহকে ভয় পায় এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও ভরসা রাখে যে , তিনি সর্বশক্তিমান ---সেই মানুষ কখনো নিষ্ঠুর ও বিকৃত আচরণ করে না। বরং চরম সাহসের পরিচয় দিয়ে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে অন্য মানুষদেরকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে যারা নিষ্ঠুর শাসকদের হাতে বন্দী। এরা মানুষকে সঠিক পথ দেখায় ও সতর্ক করে দেয়। যেমন , হযরত মুসা (আ:) একাকী সংগ্রাম করেছিলেন ফেরাউনের বিরুদ্ধে , যে ছিল হিটলার ও মুসোলিনির মতো বর্ণবাদী ও নিষ্ঠুর স্বৈরাচারী মানসিকতার। ফেরাউনের নিষ্ঠুর শাসন থেকে মুসা (আ:) বনী ইসরাইলদের রক্ষা করেছিলেন। আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থার কারণেই মুসা (আ:) এতটা সাহসী হয়েছিলেন। এই কাজ তিনি করতে পেরেছিলেন তার বিশ্বাসের কারণে যা তাঁকে দিয়েছিল ধর্মীয় মুল্যবোধ ও বিবেক-বিবেচনা। যেভাবে মুসা (আ:) ফেরাউনের কাছে গিয়েছিলেন , তার সাথে কথা বলেছেন , তা স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় আল্লাহ'র প্রতি তার বিশ্বাসের কথা , ভরসার কথা।

" .... আমি মুসাকে আমার নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার সভাসদদের কাছে পাঠাই ; কিন্তু তারা তার প্রতি জুলুম করে; সুতরাং লক্ষ্য করো , কী পরিণতি হয়েছিল ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের। মুসা বললো : হে ফেরাউন ; আমি একজন রাসূল বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের কাছ থেকে ; এটাই সঙ্গত যে , আমি সত্য ছাড়া অন্য কোন কথা

আল্লাহ'র প্রতি আরোপ করবো না। আমি তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছি তোমাদের রবের তরফ থেকে। অতএব যেতে দাও আমার সাথে বনী ইসরাইলকে"।

(সুরা আরাফ; ৭ : ১০৩-১০৫)।

বর্ণবাদ: আফ্রিকা মহাদেশে বছরের পর বছর সংঘর্ষ বয়ে নিয়ে আনে:-

অনেক দিন ধরে আফ্রিকা মহাদেশ সংঘর্ষ , যুদ্ধ , ক্ষুধা আর নিদারুণ যন্ত্রণায় পীড়িত। সত্য ও ন্যা থেকে যারা দুরে রয়েছে এবং অসাধু বিশ্বাসকে যারা মেনে চলে , তাদের মধ্যে যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব তার পরিণামে এই অঞ্চলে শ্রেষ্ঠতার লড়াই লেগেই রয়েছে। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী দে চাপিয়ে দেয়া নানা সংঘর্ষ ও বিভিন্ন বৈষম্যমুলক বর্ণবাদী নীতিতে এই এলাকার মানুষেরা যন্ত্রণার শিকার হয়েছে। ৫০ এর দশকে এই পুরো মহাদেশে মাত্র চারটি দেশ সরকারীভাবে ছিল। ১৯৬২ সালে এই সংখ্যা বেড়ে হয় ৩০। চূড়ান্তভাবে ১৯৭২ সালে কিছু ব্যতিক্রম বা পুরো মহাদেশটি স্বাধীন হয়। অবশ্য সাধারণ মানুষের কাছে এই স্বাধীনতা ছিল কে লোকদেখানো ; কেননা , সাবেক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বদলে ক্ষমতায় আসে নিষ্ঠুর স্ব নির্যাতনকারী স্বৈরাচারী প্রভুরা। এদের সবার সাথেই সাবেক উপনিবেশবাদী শক্তি অর্থাৎ এ পশ্চিমা দেশগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। যার জন্য এসব দেশে স্বাধীনতা সত্যিকার অর্থে মুক্তি আসে নি ; বরং মানুষ অভাব ও সংঘর্ষের উপনিবেশ আমলের চেয়েও বেশী কষ্ট ভোগ করেছে অত্যাচারী শাসকদের সময়। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয় স্বৈরাচারী শাসনের বি একই সময় , এই সব স্বৈরশাসকেরা বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীকে উত্তেজিত করে তোলে এবং নিজ নিজ অস্থিরতার সৃষ্টি করে এবং বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির ফায়দা লুটে।

দুইটি জাতিগোষ্ঠী Hutus ও Tutsis এর মধ্যে যায়ারে যে সংঘর্ষ হয় , তা বিংশ শতাব্দীর জ দাঙ্গার একটি সাধারণ উদাহরণ। ১৯৯৭ সালের বসন্তকালে দুই গোষ্ঠী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এর ছড়িয়ে পড়ে যায়ার , রুয়ান্ডা , উগান্ডা , বুরুন্ডি ও তানজিনিয়ায় । সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির রাজ চাপ থেকে দুর্নীতিগ্রস্থ এই অঞ্চলকে ১৯৬০ সালের স্বাধীনতা বলতে গেলে কোন ধরনের মুক্তি দিতে পারে নি। মার্কিন সমর্থনপুষ্ট জোসেফ মবুতু ১৯৬৪ সালে ক্ষমতা দখল করেন এবং দেশে প্রাকৃতিক সম্পদকে মার্কিনীদের স্বার্থে ব্যবহৃত হতে দেন--- দেশের মানুষের কল্যাণের কথা ভ মবুতু বছরের পর বছর ব্যক্তিগত সম্পদ গড়ে তোলেন এবং দেশের জনগণের দাবী দাবিয়ে স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নেন। যে সময় মুদ্রাস্ফীতির সর্বোচ্চ হার দেশে ছিল প্রায় ৬০০০%। তখন প্রধান গোষ্ঠীর মধ্যে এই অঞ্চলে তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। এই জাতিগত দাঙ্গায় গণহত্যার শিকা প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ মারা যায়। হাজার হাজার দেশত্যাগী মানুষ জঙ্গালে জঙ্গালে অত্যন্ত ভয়ংক কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত বেশীরভাগ মানুষই ক্ষুধা আর মহামারীতে প্রাণ নিরপরাধ মানুষদের জবাই করা হয় শুধু এজন্য যে তারা অন্য জাতিগোষ্ঠীর। এমন কী , শিশু

বাচ্চাদেরকেও মেরে ফেলা হয়। এই যে জাতিগত বিদ্বেষ , তা পবিত্র কুরআনে ধর্মীয় উ
হিসাবে এসেছে। কুরআনে তীব্র ধর্মোন্মত্ততার কারণে নিষ্ঠুরতা , গণহত্যার কথা বলা হয়েছে
ব্যক্তিদের এই উন্মত্ত মানসিকতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহ বলেন , " যখন ক
তাদের অন্তরে অজ্ঞতা যুগের জেদ পোষণ করছিলো , তখন আল্লাহ নিজের তরফ থেকে তাঁর র
মুমিনদের উপর নাযিল করলেন প্রশান্তি ও তাদেরকে তাকওয়ার কথার উপর সুদৃঢ় রাখলেন , আর
ছিল এর অধিক হকদার ও যোগ্য । আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ" (সুরা ফাতাহ ; ৪৮: ২৬)।

আফ্রিকা বা এই পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই হোক না কেন , বর্ণবিদ্বেষী এসব আচরণ ধর্মহীনতার অ
দিককে প্রকাশ করে। এটাকে সম্পূর্ণ দুর করা কেবল তখনই সম্ভব যখন সত্য , সঠিক ধর্মের
আমরা নিজেরা জীবন কাটাবো ও অন্যকেও তা অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারবো।

ধর্মহীন সমাজে নিষ্ঠুরতা ও বিশৃঙ্খলতা:
আগের অধ্যায়গুলিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে , পৃথিবীর সব প্রান্তেই যেমন কসোভো , কাশ্মির ,
ফিলিস্তিন , চেচনিয়া ও অন্যান্য দেশে মুসলমানরা সবসময়ই ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতা ও অনন্ত সমস্যার
হচ্ছে। যে প্রক্রিয়ায় এসব চলছে , তাতে এটা মনে করা ভুল হবে যে , এই দুইয়ের মধ্যে কোনই
নেই । আবার এসব সমস্যা একটি দেশের সাধারণ রাজনৈতিক ও ভৌগলিক সমস্যা ---এমনটি
ভুল হবে। পৃথিবীতে যেখানে যত যুদ্ধ হয়েছে , কিছু মানুষ সবসময়ই সেসব থেকে ফায়দা লুটেছে

সব মুসলমানকে এসব ব্যপার দেখে সতর্ক থাকতে হবে ; নইলে ভুল করে মনে করা হবে যে,
দুর্ঘটনাক্রমে ঘটেছে ---যার কোন সমাধানের দরকার নেই। একটি হাদীসে বলা হয়েছে , কেয়
দিন অত্যাচার / নির্যাতন অন্ধকার রুপে দেখা দেবে (টীকা ১৯: সহীহ মুসলিম , বই ৩২ , নং ৬২৪

বিংশ শতাব্দী চিহ্নিত হয়ে আছে নজিরবিহীন নিষ্ঠুরতার জন্য । এসব যুদ্ধ আর নিষ্ঠুরতার
কমিউনিস্ট বা সাম্যবাদী আন্দোলন প্রধানত দায়ী। মার্কসবাদী দর্শনতত্ত্বে বিশ্বাসী এই সাম্যবাদ
আসলে বস্তুবাদী আদর্শকে উৎসাহিত করে ও ধর্ম , নীতিকথা ও পারিবারিক মুল্যবোধকে সম্পূ
প্রত্যাখ্যান করে। যে সব দেশে কমিউনিস্ট শাসন রয়েছে , ইতিহাস প্রয়োজনের চেয়েও যথেষ্ট
প্রমাণ দেয় যে , সে সমাজে ধর্মহীনতা কিভাবে জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। রাশিয়া বহু দশ
কমিউনিস্ট শাসনে রয়েছে। ইতিহাসের দিকে একনজর চোখ ফিরালে আর রাশিয়ার
পরিস্থিতি দেখলেই এই নিষ্ঠুর পদ্ধতি সম্পর্কে আরো স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

ইতিহাসে ধর্মহীনতা : সাম্যবাদের পদচিহ্ন ধরে অনুসন্ধান

--মার্কস ও এঙ্গেলস হলো দ্বান্দ্বিক বস্তবাদ (dialectic materialism) এর প্রতিষ্ঠাতা ও কমিউনিস্ট মতের পরামর্শ দাতা । এই দুজনেই ছিল পুরোপুরি নাস্তিক। তা মতের সমর্থক ছিল যে , দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের মধ্যে দিয়েই সব উন্নয়ন হয় ; তাদের বিশ্বাস ছিল যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তাদের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। ধর্মের বিরুদ্ধে এই দুজনেরই গভীরে চরম বিদ্বেষ ছিল। মতাদর্শ বাস্তবায়নের প্রাথমিক শর্ত হিসাবে তারা মনে করলো যে নির্মূল করতে হবে। মার্কস ও এঙ্গেলস বিশ্বাস করতো যে তখনই কেবল কমিউনিস্ট আন্দোলন শুরু করা যাবে , যখন ধর্মের বাঁধন ও স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস নির্মূল হবে।

মার্কস তার মতাদর্শকে বাস্তবে রুপ দিয়ে যেতে পারেন নি । তার মৃত্যুর পর লেনিন এই চালিয়ে যান। সশস্ত্র কমিউনিস্ট জঙ্গী ও সেনাবাহিনীর মধ্যে রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের পর লেনিন ক্ষমত করেন ও আভাষ দেন এমন এক পদ্ধতির যা তার শাসন নীতিকে প্রভাবিত করবে।
লেনিনের সময়ে যারা তার ও কমিউনিস্ট শাসনের বিরোধিতা করেছিল ,তাদেরকে হত্যা ক গৃহযুদ্ধ তিন বছর ধরে চলে এবং রাশিয়াকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয় । এই রক্তাক্ত যুদ্ধে লেনিন বিশ্বে প্রথম একদলভিত্তিক স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে অর্থাৎ অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব দেশে থাকলো না।

রাশিয়ার জন্য লেনিনের শাসন ছিল অন্যতম ধ্বংসকারী আমল , বিশেষত: অর্থনীতির এমনিতেই গরীব ছিল এমন মানুষদের উপর আরো কিছু কর বসানো হলো । ক্ষুধা ও মানুষের কষ্ট বাড়তেই থাকলো। লেনিন ব্যাপকভাবে সবকিছু জাতীয়করণ করতে থাকে। তাছাড়া , সীমিত বরাদ্দ ও শিল্পের উপর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি নীতি প্রয়োগ করা হয় । কারো সাহস ছি লেনিনের এসব নীতিগুলোকে প্রতিরোধ করা । কেননা , তারা ভালভাবেই জানতো শুধুমাত্র বি করার উদ্যোগ যারা নিয়েছিল তাদের ভাগ্যে কী ঘটেছিল । লেনিন ১৯২৪ সালে মারা যায় । সে রাজনৈতিক নীতির জন্য লেনিন মানুষের প্রচন্ড ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়েছিল ; এমন কী ঘনিষ্ঠজনেরাও তাকে ঘৃণা করতো। লেনিনের পর কমিউনিস্ট দলের চেয়ারম্যান হোন স্ট্য ইতিহাসে স্ট্যালিনের মতো এমন রক্তপিপাসু স্বৈরাচার আর দ্বিতীয়টি নেই। স্ট্যালিনের দী বছরের শাসন আমলে কমিউনিস্ট পদ্ধতির ক্ষমাহীন প্রকৃতির অভিজ্ঞতা মানুষ বারবার লাভ ব খুন , গণহত্যা এবং নির্যাতন ছিল অন্তহীন । স্ট্যালিনের কমিউনিজম প্রজেক্ট মানুষের চরম কারণ হয়। লাখ লাখ মানুষ ক্ষুধা ও নিদারুণ যন্ত্রণার শিকার হয় । গ্রামের মানুষদেরকে কাজ বাধ্য করানো হতো আর নানাভাবে সাধারণ মানুষেরা ভীষণভাবে নির্যাতিত হয়। এই সময় সব ধর্মচর্চা নিষিদ্ধ করা হয়। স্ট্যালিন গ্রামবাসীদের জমি বাজেয়াপ্ত করে ; এই গ্রামবাসীরা ছিল র মোট জনসংখ্যা ৮০% । রাষ্ট্রীয়করণের অংশ হিসাবে সরকারী কর্মকর্তারা গ্রামবাসীদের ফসল নিয়ে নিতো । ফলে , লাখ লাখ শিশু , নারী ও বৃদ্ধ অনাহারের শিকার হয়।

শুধুমাত্র কাজাখাস্তানেই জনসংখ্যার ২০% না খেতে পেরে মারা যায়। ককেশাসে ১০ লাখের মানুষ মারা যায়। হাজারো মানুষ যারা এসব নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় , তা সাইবেরিয়াতে শ্রম শিবিরে বন্দী করে রাখা হতো। এসব শিবিরে বাধ্যতামূলক কাজগুলি সাংঘাতিক কষ্টদায়ক। বন্দীদের বেশীরভাগই এখানে মারা যেতো। স্ট্যালিনের গুপ্ত পুলিশ ব হাতে হাজার হাজার মানুষ খুন হয়। বাধ্যতামূলক দেশান্তরী নীতি স্ট্যালিনের নীতির অংশ হয়ে লাখ লাখ মানুষ বাস্তুহারা হয়। নিজেদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে তারা রাশিয়ার প্রত্যন্ত এলাকায় যেতে বাধ্য হয়। পুরো রাশিয়া জুড়ে কমপক্ষে ২ কোটি মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী হলো স্ট ঐতিহাসিকদের মতে , এসব নিষ্ঠুরতা থেকে স্ট্যালিন আনন্দ পেতেন এবং ক্রেমলিন অফিসে বিভিন্ন শ্রমশিবির থেকে আসা মৃতদের তালিকাসহ প্রতিবেদন পড়াটা উপভোগ করতেন। স্ট্য সময়ে শুধু যে বুদ্ধিজীবী বা যারা তার নীতির প্রতিবাদ করতো , তাদের বিরুদ্ধেই সন্ত্রাস চালানো হ নয়। কমিউনিস্ট সশস্ত্র জঙ্গীদের আক্রমণের মুখে সবাই ছিল হুমকির মুখে। কোন বাছ-বিচার না গণহারে মানুষকে বন্দী রাখা হতো 'গুলাগে' ----- এটা ছিল এক ধরনের বাধ্যতামূলক শ্রম এখানে অনেক মানুষকে হত্যা করা হয়। স্ট্যালিন সন্ত্রাস চালিয়ে গণমানুষের উপর একচ্ছত্র অ নিশ্চিত করে। তার ২৫ বছরের স্বৈরশাসন রেখে গিয়েছে আর কিছুই নয় , শুধু অভাবী মানুষদের

ধর্মহীন সমাজের পরিষ্কার একটি চিত্র রাশিয়া তুলে ধরে , যেখানে সুখী ও সন্তুষ্ট জীবনের করা কঠিন। কেননা , ধর্মহীনতার স্বাভাবিক প্রকৃতিই হলো এটা মানুষকে ব্যক্তিস্বার্থে যে কোন অপরাধে প্ররোচিত করে ; যেমন:- খুন থেকে শুরু করে মজা পাওয়ার জন্য শিশু ই ইত্যাদি । আজকের রাশিয়া সাক্ষ্য দেয় কিভাবে কয়েক দশক ধরে ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়ায় সেখানে নির্যাতিত হয়েছে। অধ:পতন হলো এই নীতির ঐতিহ্য। এই অবস্থা থেকে ফিরে একমাত্র উপায় হলো যা মানুষকে কুরআনের মূল্যবোধ সম্পর্কে জানানো এবং তাদের আ মূল্যবোধকে আবার ফিরিয়ে আনা।

মাও সে -তুংয়ের চীনে অব্যাহত অত্যাচার:

কমিউনিস্ট বিপ্লবের কৌশল গ্রহণ করে ষ্ট্যালিন রাশিয়াতে দুই কোটি মানুষকে মেরে ফেলে। রাশিয়ার এই রক্তাক্ত শাসনকে অনুসরণ করে আরেকটি কমিউনিস্ট দেশ----চীন।

১৯৪৯ সালে রক্তাক্ত এক গৃহযুদ্ধের পর মাও সে-তুং এর নেতৃত্বে চীনে কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করে। ঘনিষ্ঠ মিত্র ষ্ট্যালিনের মতো মাও ১৯৪৯ -১৯৭৬ সাল পর্যন্ত একটি নির্যাতনমূলক ও রক্তাক্ত শাসন প্রতিষ্ঠা করে। গুণে শেষ করা যাবে না ----এতো রাজনৈতিক হত্যাকান্ড চীনে ঘটেছে। কমিউনিস্ট বাহিনীর নারী ও পুরুষদেরকে নিয়ে সেনাবাহিনী গঠিত হয়। পরবর্তী মাসগুলিতে তরুণ জঙ্গীদের নিয়ে গঠিত।

"Red Guards" বাহিনী দিয়ে মাও পুরো দেশকে সন্ত্রাসের মুখে ছুড়ে ফেলে। রাশিয়ার মতো চীনেও অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটে। সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন ও

সমান অধিকারের নামে গৃহীত বিভিন্ন নীতি এর জন্য দায়ী। চীনে সেই একই চিত্রের পুনরাবৃত্তি ঘটে। মানুষ ব্যক্তি অধিকার হারিয়ে ফেলে ও রাষ্ট্রের স্বার্থে তাদের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। সংক্ষেপে , মানুষকে রক্ষা ও উপকারের নামে ফসলের মাঠ , শস্য, গবাদি পশু ও তাদের সম্পত্তি দখল করে নেয়া হয় ----ঠিক যেমনটি ঘটেছিল রাশিয়াতে।

জাতীয়করণকে বলা হলো সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের পূর্ব-শর্ত। সামাজিক ন্যায়-বিচার শুধু তাদেরকেই সমৃদ্ধ করলো যারা ক্ষমতায় ও তাদের আশেপাশে ছিল। এই সময় সাধারণ মানুষ যাদের অধিকার রক্ষার কথা বলা হয়েছিল , তারা অনাহারে মারা পড়লো। অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি আরো কঠিন বোঝায় পরিণত হলো--- প্রয়োজন দেখা দিল মূল সংস্কার সাধনের। তবে প্রতিটি সংশোধনীই নতুন নতুন দু:খ-কষ্টের কারণ ঘটালো এবং দেশে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটালো। অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রতিটি ব্যর্থতা বিশাল ভূ-খন্ডের দেশ চীনে মাও নিজ মানুষদের বিশেষত: সংখ্যালঘুদের উপর ব্যাপকহারে গণহত্যা চালায়।

কমিউনিস্ট দলের সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী ও একনায়ক মাও জীবনের সব কর্ম ও চিন্তাক্ষেত্রেই একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। চীনকে বাইরের সব প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা হয় ও সংবাদপত্র ও অন্যান্য যোগাযোগের মাধ্যমের উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। সরকারী নীতির যে কোন সমালোচনা বা প্রতিবাদের ফলাফল ছিল মৃত্যু। সংখ্যালঘু লেখক , শিল্পী ও বিজ্ঞানী যারা সংস্কৃতি , ইতিহাস ও ভাষা নিয়ে কাজ করছিল , তাদেরকে একত্র করে এই রক্তাক্ত স্বৈরশাসনে মেরে ফেলা হয়। চীনের বিভিন্ন সন্ত্রাস যেমন Uigur Turk দের হত্যাকান্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য আজো জাতিসংঘসহ পুরো বিশ্ব পুরোপুরি জানতে পারে নি। ধর্মীয় বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়া কমিউনিস্ট শাসনের প্রধান লক্ষ্য থাকে। পরে শুরু হয় নিয়মতান্ত্রিক নির্যাতন ও প্রচারণা। ধর্মীয় বিশ্বাসের জায়গায় আসে নানা মত ও দর্শন , যা তৈরী করে নেতারা যারা অতিরিক্ত শ্রদ্ধা , সম্মান পেতে আগ্রহী। চীন -- ইসলাম বিরোধিতায় অন্যতম দুর প্রাচ্যের এই দেশে ঘটলো একই ঘটনা। মাও এর শাসনের শুরুতে চীনা কর্তৃপক্ষ সব ধর্মীয় আচার-আচরণ নিষিদ্ধ করে। মুসলিম ইমামদের উপর অকথ্য অত্যাচার চলে এবং মসজিদগুলি বন্ধ করে দেয়া হয়। বস্তবাদী পদ্ধতিতে ধর্মকে বিবেচনা করা হয় সবচেয়ে বড় বাধা হিসাবে। তাই ধর্ম নিয়ে কথা বলাও ছিল নিষেধ। চীনের মানুষদেরকে একনায়কতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা ও অভ্রান্ততা সম্পর্কে খুব জোরালোভাবে শিক্ষা দেয়া হয় ; Red Book এ মাও বিস্তারিতভাবে তার অদ্ভুত আদর্শের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে। এটা স্কুলের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ছোট বাচ্চা ও কিশোর-তরুণদের বস্তবাদীতার আদর্শ শিক্ষা দেয়া হয় --

যাতে শেখানো হয় স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস মানুষের উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। একে অন্যকে খুন করতে মানুষকে উৎসাহিত করা হলো। কমিউনিস্ট পদ্ধতির স্বার্থের প্রয়োজনে এমন কী নিজের মাকেও খুন করতে বলা হলো। কমিউনিস্ট আদর্শ পরিবার প্রথাকে নিজ স্বার্থের বিরোধী মনেকরে। পরিণামে লক্ষ লক্ষ চীনা পরিবারে ভাঙ্গন ধরে। দেশের তথাকথিত অর্থনৈতিক মঙ্গালের জন্য পরিবার থেকে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে , শিশুদেরকে ইয়াতীমখানায় নেয়া হয় এবং বছরে মাত্র একবার পরিবারের সবাই একসাথে হতে পারতো।এসবই খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । কেননা, এখনো পৃথিবীতে কমিউনিস্ট মতের প্রচার/প্রসার ঘটছে। এই মতকে গ্রহণ করা হলে একটি দেশের ভবিষ্যত রাশিয়া বা চীন থেকে আলাদা কিছু হবে না। এমন একটি পদ্ধতি যা চিহ্নিত হয়ে আছে গণহত্যা , সন্ত্রাস , ক্ষুধা ও অমানবিকতা দিয়ে ; তা থেকে একটি দেশকে মুক্ত রাখার একটাই উপায় ----মানুষকে বিশেষত: কিশোর-তরুণদেরকে ধর্ম সম্পর্কে সচেতন করা। অবিশ্বাসী মানুষেরা সত্য ধর্ম সম্পর্কে কিছু জানে না। ফলে , ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় তারা কমিউনিস্ট আদর্শে ঝুঁকে পড়ে। এই কারণেই বস্তুবাদী আদর্শ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী বিরোধী শক্তি হিসাবে ধর্মকে বিবেচনা করে। ধর্মের ব্যাখ্যা মানুষকে ঘৃণা থেকে পরিশুদ্ধ করবে। একই সাথে কমিউনিস্ট দর্শণের ভুল-ত্রুটি সবার সামনে তুলে ধরতে হবে। একটি দেশকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে এ ধরনের কিছু সতর্কতা গ্রহণ করা যেতে পারে।

মুক্তির একমাত্র উপায় হলো কমিউনিজম ----এ কথা বলে কমিউনিস্ট শাসকরা মানুষের সাথে প্রতারণা করেছে। কমিউনিস্টদের লক্ষ্য অর্জন করার জন্য লক্ষ , লক্ষ মানুষকে অমানবিক শাস্তি দেয়া হয়। এ্যমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মাঝেমধ্যেই প্রতিবেদন দেয় যে , চীনের সীমা ভিতরে সংখ্যালঘু বিশেষত: মুসলমানদের উপর নির্মম অত্যাচার এখনো চলছে।
বন্দীরা নিজেদের সমর্থনে কিছু বলতে বা করতে পারে না।এদেরকে সারাক্ষণই মাথা নুইয়ে রা বাধ্য করা হয়। মুসলমানদেরকে নিষ্ঠুর ও অমানবিকভাবে শাস্তি দেয়ার কথা জানা গিয়েছে।

ঐতিহাসিকরা এখন বিতর্ক করছে ,কমিউনিস্টরা কি ১০০ মিলিয়ন মানুষকে মেরেছে না কি " মা ৮০ মিলিয়নকে মেরেছে ?

ধর্মবিরোধী পদ্ধতি মানুষের যে সব ক্ষতি করে :-

১। নৈতিক মূল্যবোধের উপর গড়ে উঠা সব যুক্তি এবং বিবেক-বিবেচনা একনায়কতন্ত্রে নির্মূল যায়। এছাড়া ,সমাজে জোর-জুলুম , অত্যাচার চলে। একনায়কতন্ত্রে মানুষের মৌলিক অধিকার স্বাধীনতা বলে কিছুই থাকে না। নৈতিক মূল্যবোধ পুরোপুরি উপেক্ষিত হয় ও কায়েমী স্বার্থবাদ

সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্মহীনতার নীতিকে সমর্থন করে না , এমন সব কার্যক্রম এই সমাজে নি
করা হয়।

২। মানুষকে এটা বিশ্বাস করানো হয় যে , একনায়ক হলেন অভ্রান্ত। সব ধর্মবিরোধী শাসনেই
নাৎসীবাদ ও কমিউনিস্ট) আমলে নেতাকে পূজা করার বিকৃত
মন-মানসিকতার প্রচলন ছিল।

৩। ধর্ম পালন ও চিন্তার স্বাধীনতা খর্ব হয়। মসজিদ , মন্দির , গির্জা , সীনাগগ
(ইয়াহুদীদের প্রার্থনার জায়গায়) যাওয়া নিষিদ্ধ হয়। ধর্মীয় কথাবার্তা ও নিষিদ্ধ হয়ে যায় । ধ
মোকাবেলা করার জন্য জাতীয় বাজেট থেকে বিশেষ বরাদ্দ দেয়া হয় (টীকা ২০- Ali Bula
Çağdaş Kavramlar ve Düzenler (Contemporary Concepts and Order
p.108)

৪। অর্থনীতি থাকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। ব্যক্তিগত বিনিয়োগ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ক
কারখানা , উৎপাদনের উপকরণ , উৎপাদনের সুবিধাসমূহ এবং ব্যাংক সবই জাতীয়করণ করা হয়।

৫। কমিউনিস্ট যোদ্ধারা ব্যক্তিগত সব প্রতিষ্ঠান বাজেয়াপ্ত করে। শস্যক্ষেত , গ্রামবাসীদের ফসল
দেশের বৃহত্তর স্বার্থে '' রাষ্ট্রের সম্পত্তি হয়ে যায়।

৬। ক্ষুধা ও অনাহারে নারী , শিশু ও বৃদ্ধসহ লক্ষ , লক্ষ মানুষ মারা যায়। এই ব্যাবস্থা সৃষ্টি ক
গরীব ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের ; সবার উপর কঠিন এক জীবন চাপিয়ে দেয়া হয়। এ জীবনে
টুকরো রুটি কেনার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাড়িয়ে থাকতে হয়।

৭। মানুষকে শ্রম শিবিরে বন্দী করে রাখা হয় এবং গণহারে মেরে ফেলা হয়। যারা বেঁচে থাকে ত
কঠিন সব পরিস্থিতিতে বাধ্যতামূলক পরিশ্রমে বাধ্য হয়। যারা এসব কাজের শর্ত মেনে নিতো
,তাদেরকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠানো হতো।

৮। বিদ্রোহীদেরকে কমিউনিস্ট জঙ্গীরা মেরে ফেলতো । মানুষের চোখের সামনে বিদ্রোহীদেরকে
করে মেরে ফেলা হতো।

৯। রাজনীতিবিদ বা বুদ্ধিজীবি যেই হোক না কেন , নীতির বিরোধিতা বা সমালোচনা করে
তাদেরকে মেরে ফেলা হতো।

১০। যারা ক্ষমতায় থাকে তারা থাকে অপরিসীম প্রাচুর্যের মধ্যে আর সাধারণ মানুষরা জী
কাটায় কষ্ট ও যন্ত্রণার ভিতর। যেমন , যখন কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতা দখল করলো ,
তখন দেশের একজন সাধারণ কর্মী ও দলের সদস্যদের বেতনের মধ্যে পার্থক্য ছিল
২৫-৩০ হাজার রুবেল। কমিউনিস্টদের বেতন ব্যক্তিবিশেষে ছিল ২৫ হাজার থেকে শুরু ক
১০০ হাজার রুবল যেখানে সাধারণ মানুষদের মধ্যে বেশীরভাগেরই বেতন ছিল মাত্র ১৫০ রুব
এছাড়াও , কমিউনিস্ট দলের সদস্যদের ছিল প্রাসাদ , গাড়ি ,বিনা পয়সার স্বাস্থ্য সেবা সুবি
ইত্যাদি। এসব কোন সুযোগ-সুবিধাই সাধারণ মানুষদের ছিল না -- যাদের শ্রম ছিল জা
অর্থনীতির মেরুদন্ড { টীকা ২১- *Mahmud Ahmet, Islam Iktisadı (Islamic Econom*
p.80 }

১১। অত্যাচারী শাসকদের পুলিশ বিভাগ সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে বাধ্য রাখতো। জন
সারাক্ষণই হুমকির মুখে থাকতো।

১২। কমিউনিস্ট পার্টি দেশকে অন্তহীন বিরোধ , দাঙ্গা আর বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে যায়।

১৩। নির্যাতনমূলক ও একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্কুলের উপরেও প্রভাব ফেলে। লেনিনের মতে
শিক্ষা জাগতিক , নিরপেক্ষ ও রাজনীতি মুক্ত হবে না। ১৯১৮ সালের ২৫ অগাস্ট সোভিয়ে
শিক্ষার উপর প্রথম কংগ্রেসের ভাষণে লেনিন বলেন , শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো বুর্জোয়াদের অপস
করা। তিনি স্পষ্ট ঘোষণা দেন যে , রাজনীতির বাইরে কোন শিক্ষা নেই এবং বাকী সব বি
হলো নির্ভেজাল মিথ্যা ও ভন্ডামী (টীকা ২২- Alija Ali Izetbegovic, *Islam Betwe*
East and West, p. 102)

শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় ধর্মহীন , নীতিহীন দুর্বল বংশধর গড়ে তোলা , যাদের কোন বোধ থাকবে
আর কমিউনিস্টদের স্বার্থে কাজ করবে।

১৪। ধর্মহীন বিশ্বাসে তরুণদের মগজ ধোলাই করা হয় আর ধর্মহীন নীতি শান্তিকামী মানু
বদলে সশস্ত্র জঙ্গীদের সৃষ্টি করলো।

১৫। পরিবার প্রথার মতবাদ বিলুপ্ত হয়। শিশুদেরকে পরিবার থেকে আলাদা করে ফেলা হয়
তারা ইয়াতীমখানায় বড় হতে থাকে। পরিবারকে মনে করা হলো রাষ্ট্রের স্বার্থ বিরোধ
কমিউনিস্টদের সভাতে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেল যে , যতদিন পর্যন্ত পারিবারিক ব
আর পরিবার প্রথা টিঁকে থাকবে , ততদিন পর্যন্ত দুর্বল হয়ে থাকাটাই বিপ্লবের ভা

অপরিবর্তনীয় লিখন হয়ে থাকবে (টীকা ২৩- Ali Bulac, *Çağdaş Kavramlar Düzenler(Contemporary Concepts and Orders)*, p.114)

১৬। শিল্পকলা , বিজ্ঞান কমিউনিস্ট শাসনে লাভ করার কোন সুযোগ পায় নি। কেননা , জা বাজেটের বেশীরভাগই খরচ হতো অস্ত্রের পিছনে ; যা কিনা ব্যবহার করা হতো গণমানু অত্যাচার ও হত্যা করতে ।

১৭। তরুণদের সামনে জীবনের কোন মহৎ লক্ষ্য ছিল না। তাই তরুণদের মধ্যে আত্মহত্যার হার বাড় লাগলো। এই ব্যবস্থা নিজেই তরুণদেরকে মদ ও মাদকের নেশার পথে ঠেলে দিলো।

১৮। প্রেসের স্বাধীনতা বলতে কিছুই থাকে না। যতক্ষণ পর্যন্ত নেতা ও নীতির প্রশংসা করা হ ততক্ষণই শুধু প্রকাশ ও প্রচারের স্বাধীনতা থাকে। এছাড়া , প্রেসকে নিশ্চুপ থাকতে হয়।

উপসংহার: ....“ আর আমাদের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টরুপে প্রচার করা (সুরা ইয়াসিন; ৩৬: ১৭)।

ক্ষুধা থেকে অভাব , মাদক থেকে নীতিহীনতা , এই বইতে আমরা বিশ্বের অনেক সমস্যা নি আলোচনা করেছি যা আশু সমাধানের দাবী রাখে। নি:সন্দেহে আমরা সবাই এই সব সমস্যার স পরিচিত। এরপরও এটাই সত্য যে , বেশীরভাগ মানুষই কখনো এর একটিরও সমাধানের কোন দায়-দায়িত্ব কখনো অনুভব করে নি। বরং আমরা এ নিয়ে চিন্তা করাটা পর্যন্ত এড়িয়ে গিয়ে অন্যদিকে , কিছু মানুষ এসব সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছেন ; অন্য মানুষের দৃষ্টি আকর্ষ চেষ্টা করেছেন এবং মনে মনে ভীষণ কষ্ট পেয়েছেন এসব সমস্যা সমাধানে মানুষের ব্যর্থতার জন্য।

দীর্ঘদিন ধরে এসব সমস্যার সমাধানে মানুষের ব্যর্থতার কারণ হলো দোষে ভরা বিভিন্ন মতবা পদ্ধতি ; যাদেরকে আমরা আশ্রয় করেছি। সমাধান রয়েছে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ'র পথে ফি আসার মধ্যে ; আল্লাহ এই পথকেই মানবজাতির জন্য নির্বাচিত করেছেন।

এটি একটি পুরোপুরি ভুল সিদ্ধান্ত হবে যদি আমরা সমস্যায় ভরা জীবনকে তার সব দোষ-ত্রুটি যেমন আছে ঠিক তেমনটি-ই মেনে নেই ; অথবা নিশ্চুপ হয়ে থাকি অথবা শুধু তাকিয়ে তাকি দেখি যে এই সব অসম্পূর্ণতাকে নিয়ে কিভাবে এই পৃথিবী পরিশুদ্ধ হওয়ার দুর্লভ প্রত্যাশা কর পারে। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন , যে পথে এগুলে আমরা শান্তি ও নিরাপত্তা পাবো , সে তিনি সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ এই পদ্ধতির কথা আমাদের জানিয়েছে সুরা নাহলে আল্লাহ বলেন , “...আমি আত্মসমর্পনকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাকার পথ নির্দেশ , রহমত ও সুসংবাদ হিসাবে তোমার কাছে কিতাব নাযিল করেছি (১৬: ৮৯)।

জীবনের সকল ক্ষেত্রেই কুরআন মানুষকে পথ দেখিয়ে সত্যের দিকে নিয়ে যায়। ইসলামের সত্যি বিশুদ্ধ মূল্যবোধ কোন ঘৃণা ও মানুষের সংযোজন ছাড়া যদি মানবজাতির কাছে পৌঁছে দেয়া য তাহলে বর্তমান পৃথিবীর সব সমস্যার সমাধানই সম্ভব।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যা উল্লেখের দাবী রাখে তাহলো ---আল্লাহ মানুষকে এই জীবনে ও মৃ পরবর্তী জীবনে তার রহমতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন-----কুরআনে অনুগত থাকার এটা একটা কারণ । এর পরিণামে কুরআন জীবনের সমস্যা দুর করে এবং আল্লাহ যিনি মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল , তিনি মানুষকে পুরষ্কার হিসাবে দান করবেন সুন্দর একটি জীবন যা এই পৃথিবীর সমস্যা ও কষ্ট থেকে পরিশুদ্ধ।

সুরা নাহলে আল্লাহ বলেছেন , " তোমাদের কাছে যা আছে তা নি:শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লা কাছে যা আছে তা চিরস্থায়ী। যারা সবর (ধৈর্য ধারণ) করে , আমি অবশ্যই তাদেরকে দান কর তারা যা করতো তার চেয়ে উত্তম পুরস্কার। যে ভাল কাজ করে এবং যে মুমিন , হোক সে পু কিংবা নারী , আমি তাকে অবশ্যই দান করবো এক পবিত্র শান্তিময় জীবন এবং তারা যা করতে তার জন্য তাদেরকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবো " (১৬:৯৬-৯৭)।

কুরআনের মূল্যবোধেই রয়েছে সমাধান । তাই বিবেকসম্পন্ন বিশ্বাসীদের জন্য এটা একটি বড় ক যে তারা মানুষের কাছে কুরআনের বাণী পৌঁছে দিবে।

...." আর আমাদের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টরুপে প্রচার করা (সুরা ইয়াসিন; ৩৬: ১৭)।

বিবর্তনবাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা :

" তিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান স্তরে স্তরে । তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে দয়াময় আল্লাহ'র সৃষ্টিতে। আবার ফিরাও দৃষ্টি , কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি ? (সুরা মুলক; ৬৭ : ৩)

এই মহাবিশ্বের সব কিছুই এক শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টির দিকে নির্দেশনা দেয়। অন্যদিকে , বস্তুবাদিতা মহাবিশ্বের সৃষ্টি তত্ত্বকে অস্বীকার করে যা আর কিছুই নয় , বরং এক অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। বস্তুবাদী মতবাদ যখন বাতিল হয়ে যায় , তখন এই আদর্শের উপর গড়ে উঠা অন্য সব মতবাদ ভিত্তিহীন হয়ে যায়। সবচেয়ে প্রথমেই আসে ডারউইনিজমের কথা অর্থাৎ বিবর্তনবাদের তত্ত্ব। এই মতে দাবী করা হয় -- কেবল ঘটনাচক্রেই জড়জগত থেকে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ এই মহাবিশ্বকে সৃষ্টি

করেছেন -- এই স্বীকৃতির সাথে সাথেই এই তত্ত্ব মিথ্যা হয়ে যায় নক্ষত্রের রাসায়নিক ও পদার্থতত্ত্ববিদ Hugh Ross ব্যাখ্যা করে বলেন , নাস্তিকতা , ডারউইনিজম ও অন্যান্য সব মতবাদের উৎপত্তি হয় ১৮ শ' থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যে । এই সময়ের মধ্যে যে সব দার্শনিক মত গড়ে উঠেছিল , সে সবকে সত্য বলে ধরে নেয়া হয়েছিল ; ভুলভাবে মনে করা হয়েছিল যে মহাবিশ্ব হচ্ছে অসীম। এই মহাবিশ্বসহ প্রাণের সৃষ্টির পিছনে যে যুক্তি রয়েছে , অভূতপূর্ব উপায়ে আমরা তার মুখোমুখি হই (টীকা ২৪ Hugh Ross, *The Fingerprint of God*, p. 50)

তিনিই আল্লাহ যিনি এই মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকেও সুন্দরভাবে বানিয়েছেন। সেজন্য বিবর্তনবাদ তত্ত্ব অনুযায়ী জীবন্ত প্রাণী আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট হয় নি বরং ঘটনাচক্রে সৃষ্ট--- এটা অসম্ভব । এখানে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে , আমরা যখন বিবর্তন মতের দিকে তাকাই , তখন দেখি এই মত বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণাদিকে প্রত্যাখ্যান করছে। জীবনের নক্শা খুবই জটিল ও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। জীবনের এই অভূতপূর্ব নক্শা বিংশ শতাব্দীর শেষে ডারউইনের মতকে অবৈধ করে দেয়।

আমাদের কিছু বইতে এই বিষয় নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং ইনশা আল্লাহ ভবিষ্যতেও করবো। আমরা মনে করি , এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে একটি সংক্ষিপ্ত সারমর্ম এখানে প্রদান করলে তা অনেকের উপকারে আসবে।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসাবে ডারউইনিজমের পতন:

যদিও এই মতবাদের উদ্ভব সেই প্রাচীন গ্রীস থেকে ; বিবর্তনবাদের তত্ত্ব মূলত: জোরদার প্রচার পায় ১৯ শতাব্দীতে এসে। এই মত নিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয় যখন ১৮৫৯ সালে চার্লস ডারউইনের *"The Origin of Species"* বইটি প্রকাশিত হয়। এর পরপরই বিজ্ঞানের জগতে এই মতবাদ আলোচনার শীর্ষে চলে আসে।

এই বইতে ডারউইন অস্বীকার করেন যে আল্লাহ বিভিন্ন জীবন্ত প্রাণীকে আলাদা আলাদাভাবে সৃষ্টি করেছেন। ডারউইনের মতে , সব জীবন্ত প্রাণীর পূর্ব-পুরুষ একই এবং পরে কিছু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাণীদের মধ্যে বৈচিত্র্য এসেছে।

ডারউইনের মতবাদ কোন জোরালো বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণাদির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তিনি নিজেও এটা স্বীকার করেন যে , এসবই কেবল ' অনুমান '। এছাড়াও ,

তার বইয়ের একটি দীর্ঘ অধ্যায় Difficulties of the Theory তে ডারউইন স্বীকার করেন যে , অনেক জটিল প্রশ্নের মুখে এই তত্ত্ব ব্যর্থ প্রমাণিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের নব-নব আবিষ্কারের উপর ডারউইন তার সব আশা - ভরসা অর্পণ করেন । তিনি আশা করেন যে , নতুন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে এই মতবাদের সমস্যাগুলির সমাধান বেরিয়ে আসবে। যদিও দেখা গেল , নতুন বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদি তার আশার ঠিক উল্টো কাজটি ঘটালো। সমস্যার বহুমাত্রিক জটিলতা বরং বৃদ্ধি পেল। বৈজ্ঞানিকভাবে ডারউইন যে ব্যর্থ , তা তিনভাবে পর্যালোচনা করা যায়।

১। এই তত্ত্ব কোনভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারে না , কিভাবে এই পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি হলো ?

২। সৃষ্টির পিছনে বৈপ্লবিক যে কৌশলের দাবী এই মত করে , বৈজ্ঞানিক কোন তথ্যাদি এমনটি প্রমাণ করে না যে , এভাবে প্রাণের বিকাশ সম্ভব।

৩। জীবাশ্ম (ফসিলের) রেকর্ড বিবর্তনবাদের দাবীর সম্পূর্ণ বিপরীত মতটিই প্রমাণ করে। এই বিভাগে আমরা এই তিনটি মৌলিক দিক নিয়ে আলোচনা করবো।

জীবনের উৎপত্তি:

বিবর্তনবাদীরা দাবী করে যে আজ থেকে ৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে আদিম পৃথিবীতে একটি মাত্র জীবকোষ থেকে সব জীবন্ত প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে। এই মত অবশ্য উত্তর দিতে পারে না যে , কিভাবে এককোষী সেল থেকে লক্ষ-কোটি বহুকোষি প্রাণীর উদ্ভব সম্ভব ? আর যদিও বা সত্যি সত্যি এভাবে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে , তবে কেন জীবাশ্মের রেকর্ডে এর কোন প্রমাণ নেই ? প্রথমেই বলা যায় , এই তথাকথিত বিবর্তনবাদের প্রক্রিয়ায় প্রথম কোষ কিভাবে আসলো ? যেহেতু বিবর্তনবাদ সৃষ্টিকে অস্বীকার করে এবং কোন অতি-প্রাকৃতিক বিষয়কে স্বীকার করে না ; এরা মনে করে ঘটনাচক্রে প্রথম কোষের সৃষ্টি হয়েছে এবং তা প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে থেকেই-- কোনরকম নক্শা পরিকল্পনা বা ব্যবস্থা ছাড়াই।

এই মতবাদ অনুসারে প্রাণহীন অবস্থা থেকে ঘটনাচক্রে জীবন্ত কোষের উদ্ভব ঘটে। এটি অবশ্য জীববিজ্ঞানের কোন নিয়মের সাথেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

জীবন থেকে জীবন এসেছে :

ডারউইন তার বইতে কখনোই জীবনের উৎপত্তি ঠিক কিভাবে হলো , তার বিস্তারিত উল্লেখ করেন নি। তার সময়ে বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক যে ধারণা তার ভিত্তি ছিল এই যে , জীবন্ত প্রাণীর কাঠামো খুবই সহজ-সরল। মধ্যযুগে (পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী) আরেকটি তত্ত্ব বলা হলো -- spontaneous generation (নিজে থেকে সৃষ্ট)। এই মত অনুমান করে যে , বিভিন্ন জড়পদার্থের নানা উপকরণ থেকে জীবকোষের সৃষ্টি হয়েছে ---এই মত বিপুলভাবে গৃহীত হয়। সাধারণভাবে মনে করা হলো যে , পোকা-মাকড় এসেছে খাদ্যের উচ্ছিষ্ট থেকে , ইঁদুর এসেছে গম থেকে ইত্যাদি। এই মত প্রমাণ করতে আকর্ষণীয় সব পরীক্ষা- নিরীক্ষা
করা হলো । কিছু গম রাখা হলো ময়লা কাপড়ের ভিতরে। আশা করা হলো , কোন ইঁদুর বেরিয়ে আসবে তা থেকে। একইভাবে মাংসের মধ্যে পোকার জন্ম হওয়াকে মনে করা হলো নিজে থেকে জন্মের প্রমাণ হিসাবে। পরে জানা গেল , মাংসের মধ্যে আসলে কীটের জন্ম হয় নি। মাছি এসবকে লার্ভার আকারে বহন করে নিয়ে আসে , যা খালি চোখে দেখা যায় না।

এমন কী , যে সময়ে ডারউইন *The Origin of Species* বই লিখেছিলেন , সে সময় বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে ব্যাপকভাবে এটা বিশ্বাস করা হতো যে , প্রাণহীন বস্তু থেকে ব্যাকটেরিয়ার জন্ম হওয়া সম্ভব। ডারউইনের বই বের হওয়ার পাঁচ বছর পর লুই পাস্তুরের আবিষ্কার এই বিশ্বাসকে মিথ্যা প্রমাণ করলো যা বিবর্তনবাদের মূল ভিত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। দীর্ঘ সময়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা গবেষণার পর পাস্তুর সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে , প্রাণহীন জড় পদার্থ থেকে প্রাণের বিকাশ সম্ভব , এই দাবীর কবর ইতিহাসে রচিত হলো ভাল'র জন্যই (টীকা ২৫-Sidney Fox, Klaus Dose, *Molecular Evolution and The Origin of Life*, New York: Marcel Dekker, 1977. p. 2)

বিবর্তনবাদের সমর্থকরা দীর্ঘদিন ধরে পাস্তুরের প্রমাণাদির বিরোধিতা করে ; যদিও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে জীবন্ত প্রাণীর জটিল কোষ কাঠামোর ব্যাখ্যা ঘটনাচক্রের প্রাণের সৃষ্টির মতবাদকে আরো বেশী কোণঠাসা করে ফেলে।

বিংশ শতাব্দীর অমীমাংসিত উদ্যোগ :

বিশিষ্ট রুশ জীববিজ্ঞানী আলেকজান্ডার অপারিন প্রথম বিবর্তনবাদী যিনি বিংশ শতাব্দীতে জীবনের উৎপত্তি মতবাদ নিয়ে কাজ করেন। ১৯৩০ সালে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন,ঘটনাচক্রে জীবন্ত প্রাণীর জীবকোষ সৃষ্টি

সম্ভব। এই পরীক্ষাগুলি অবশ্য ব্যর্থ হয় এবং অপারিন স্বীকার করেন যে , " দুর্ভাগ্যক্রমে জীবকোষের উৎপত্তি এমন এক প্রশ্ন হয়ে রয়ে গেল যা প্রকৃতপক্ষে পুরো বিবর্তনবাদের সবচেয়ে অন্ধকার অধ্যায় " (টীকা ২৬-Alexander I. Oparin, *Origin of Life*, (1936) New York, Dover Publications, 1953 (Reprint), p.196)

অপারিনের সমর্থক বিবর্তনবাদীরা পরেও প্রাণের উৎপত্তি প্রশ্নের সমাধানে অনেক পরীক্ষা চালিয়ে যান। এ সবের মধ্যে সেরা বিবেচনা করা হয় ১৯৫৩ সালে করা মার্কিন রসায়নবিদ স্ট্যানলী মিলারের পরীক্ষাকে। তিনি দাবী করেন , বিভিন্ন গ্যাসের সমন্বয়ে পরীক্ষাগারে পৃথিবীর আদিম বায়ুমন্ডল তৈরী করা হয় । প্রোটিনের আকারে বেশ কিছু জৈব অণুর অস্তিত্ব ঐ মিশ্রণের মধ্যে পাওয়া যায় । অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই প্রকাশ পেল যে , ঐ পরীক্ষা যাকে বিবর্তনবাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে মনে করা হচ্ছিলো -- তা আসলে অবৈধ। সত্যিকারের পৃথিবীর আবহাওয়া থেকে পরীক্ষাগারের কৃত্রিম পরিবেশ ভীষণভাবে আলাদা ছিল । (টীকা ২৭- "New Evidence on Evolution of Early Atmosphere and Life", *Bulletin of the American Meteorological Society*, vol 63, November 1982, p. 1328-1330)

দীর্ঘ নীরবতার পর মিলার স্বীকার করেন , আবহাওয়ার মাধ্যম হিসাবে তিনি যা ব্যবহার করেছিলেন , তা বাস্তবসম্মত ছিল না । (টীকা ২৮-Stanley Miller, *Molecular Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic Synthesis of Small Molecules*, 1986, p. 7)

পুরো বিংশ শতাব্দী জুড়ে সব বিবর্তনবাদীরা প্রাণের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়। সান ডিয়াগো স্ক্রিপস ইনস্টিটিউটের ভূ-রসায়নবিদ জেফরী বাদা এই ব্যর্থতা স্বীকার করে ১৯৯৮ সালে *Earth* ম্যাগাজিনে একটি প্রতিবেদন লিখেন : " পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ কিভাবে ঘটলো ? আজ আমরা যখন বিংশ শতাব্দী পার করে দিচ্ছি ---তখনো আমাদের সামনে এই সবচেয়ে বড় অমীমাংসিত সমস্যাটি তেমনই রয়ে গিয়েছে , ঠিক যেমনটি ছিল আমরা যখন এই শতাব্দীতে প্রবেশ করেছিলাম (টীকা ২৯ -Jeffrey Bada, *Earth,* February 1998, p. 40)

প্রাণের জটিল কাঠামো:

প্রাণের বিকাশ নিয়ে বিবর্তনবাদীদের কোণ-ঠাসা অবস্থার প্রাথমিক কারণ হলো , আপাত:দৃষ্টিতে একদমই সাধারণ যে প্রাণী , তারও থাকে অবিশ্বাস্য জটিল কাঠামো । জীবন্ত প্রাণীর জীবকোষ মানুষের তৈরী যে কোন কারিগরী পণ্যের থেকে অনেক বেশী জটিল। আজ বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত পরীক্ষাগার গুলিতেও অজৈব উপাদান দিয়ে জীবন্ত জীবকোষ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। জীবকোষ গঠনের প্রক্রিয়া এত জটিল ও ব্যাপক যে , ঘটনাচক্র বলে তা ব্যাখ্যা করা যাবে না।

প্রাটিন থাকার সম্ভাব্যতা , কোষ নির্মাণের প্রয়োজনীয় ছাঁচ যাকে কোষের অট্টালিকা বানানোর ব্লক বলা হয় --এত কিছুর সমন্বয় ঘটনাচক্রে অসম্ভব। কোন প্রোটিন তৈরী হতে গড়ে দরকার ৫০০ এমিনো এসিডের ---আপনাআপনি এমনটি ঘটার সম্ভাবনা একের পর ৯৫০ বার শূন্য লিখলে যে সংখ্যা পাবো তার মধ্যে মাত্র একবার। অংকের হিসাবে কাগজে - কলমে একের পর ৫০ বার শূন্য লিখলে যা পাবো সে সংখ্যা থেকে ঘটার সম্ভাবনা কম থাকলে বাস্তবে তা কখনোই ঘটবে না --একেবারেই অসম্ভব ।

কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে ডি এন এ অণু থাকে এবং যাতে জেনেটিক তথ্য আছে তা এক অবিশ্বাস্য তথ্য ভান্ডার। হিসাব করে দেখা গেছে , ডি এন এ'র ভিতরে যে তথ্য থাকে তা যদি লেখার আকারে প্রকাশ করা হয় , তবে একটি বিশাল আকৃতির লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা যাবে যাতে রয়েছে ৯০০ খন্ডের এনসাইক্লোপিডিয়া এবং যার প্রতিটিতে রয়েছে ৫০০ পাতা।

একটি খুব মজার উভয় সংকট সৃষ্টি হয় এই পর্যায়ে। ডি এন এ পরিপূর্ণতা পায় কেবল তখনই যখন নির্দিষ্ট কিছু প্রোটিন (এনযাইম) উপস্থিত থাকে , আবার ডি এন এর মধ্যে সংরক্ষিত তথ্যাদির সমন্বয় ছাড়া সেই এনযাইম গঠণ সম্ভব নয়। যেহেতু এই দুইটি একে উপরের উপর নির্ভরশীল , তাই এই দুইটির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য একই সময়ে দুটিরই উপস্থিতি প্রয়োজন। এই পরিস্থিতিতে স্বত:স্ফূর্তভাবে প্রাণের বিকাশ হয়েছে এই মতবাদের পক্ষে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়াগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক লেসলি অরগেল ১৯৯৪ সালের *Scientific American* ম্যাগাজিনে এটা স্বীকার করেন : এটা একেবারেই অসম্ভব যে প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিডসমূহ যাদের কাঠামো খুবই জটিল , তারা একই সময়ে একই জায়গায় একইসাথে আপনাআপনি জন্ম নিয়েছে। এছাড়া , এটাও কার্যত: অসম্ভব যে একটি ছাড়া অন্যটির জন্ম হয়েছে। তাই প্রাথমিকভাবে একজনকে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয়

যে , প্রাণের সৃষ্টি কখনোই রাসায়নিক উপকরণ দিয়ে হয় নি। (টীকা ৩০-Leslie E. Orgel, *"The Origin of Life on Earth", Scientific American*, Vol 271, October 1994, p. 78)

কোনই সন্দেহ নেই যে ,প্রাকৃতিকভাবে যদি প্রাণের বিকাশ অসম্ভব হয়ে থাকে , তবে এটাই মেনে নিতে হবে যে প্রাণের " সৃষ্টি " হচ্ছে
অতি-প্রাকৃত বা অলৌকিক ব্যপার। এই বাস্তবতা সেই বিবর্তনবাদের যাকে স্পষ্টভাবে অকার্যকর প্রমাণ করে , যার প্রধান লক্ষ্য হলো স্রষ্টার সৃষ্টিকে অস্বীকার করা।

বিবতর্নবাদের কাল্পনিক বিশেষ কলাকৌশল :

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় যা ডারউইনের মতকে মিথ্যা প্রমাণ করে তাহলো , যে দুইটি তত্ত্ব বলা হয়েছিল বিবর্তনবাদের কলাকৌশল হিসাবে , তা বাস্তবে কোন বিবর্তনের শক্তি রাখে না।

ডারউইন তার বিবর্তনবাদীদের জন্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেন " প্রাকৃতিক নির্বাচনের " কৌশলের উপর। এই কৌশলের উপর তিনি যে বিশেষ গুরুত্ব দেন তার প্রমাণ বইয়ের নামকরণে পাওয়া যায়-
The Origin of Species, By Means Of Natural Selection…

প্রাকৃতিক নির্বাচনের মুল কথা হলো প্রকৃতিতে জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে যারা বেশী শক্তিশালী ও বেঁচে থাকার জন্য বেশী উপযোগী , তারাই প্রকৃতিতে খাপ খাইয়ে জীবন সংগ্রামে টিঁকে থাকে। যেমন: হরিণের দল সবসময়ই হিংস্র পশুদের আক্রমণের হুমকির মুখে থাকে। এদের মধ্যে যে বেশী জোরে দৌড়াতে পারবে, সে বাঁচবে। তার ফলে হরিণের দলে শেষ পর্যন্ত থাকবে কেবল দ্রুততম ও শক্তিশালী হরিণ। যদিও প্রশ্নাতীতভাবে এই কৌশল হরিণকে বিবর্তনবাদের মাধ্যমে অন্য কোন প্রাণী যেমন ঘোড়াতে পরিণত করবে না। তাই , প্রাকৃতিক নির্বাচনের কৌশলের আসলে কোন প্রাণীকে রুপান্তরের ক্ষমতা নেই। ডারউইন নিজেও এই সত্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং তার বই *The Origin of Species* এ এটা স্বীকার করেছেন :
Natural selection can do nothing until favourable variations chance to occur
" প্রকৃতিতে অনুকূল কোন পরিবর্তন না আসা পর্যন্ত কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নির্বাচন নিজে কিছু করতে পারে না-- (টীকা ৩১: Charles Darwin, *The Origin of*

Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, p. 189)

লামার্কের প্রভাব:

তো কিভাবে এই "পছন্দের পরিবর্তনগুলি " ঘটে ? ডারউইন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন তার সময়ের বিজ্ঞান সম্পর্কে আদি ধারণাসমূহ থেকে। ফ্রেঞ্চ জীববিজ্ঞানী লামার্ক যিনি ডারউইনের পূর্বসুরী , তার মতে: বেঁচে থাকার সময় প্রাণী যে সব নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে , তা বংশধরদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। এর ফলে নতুন এক প্রজাতির সৃষ্টি হয়। যেমন , লামার্কের মতে , জিরাফ এসেছে এন্টিলোপ থেকে। এই জাতীয় হরিণ বেঁচে থাকার জন্য উঁচু গাছের পাতা খাওয়ার চেষ্টা করতো ; ফলে তাদের গলা বংশ পরম্পরায় ধীরে ধীরে লম্বা হতে থাকে।

ডারউইনও অনেকটা একই ধরনের উদাহরণ দেন। The Origin of Species বইতে তিনি উদাহরণ দেন যে , কিছু ভালুক পানিতে খাবার সন্ধান করতে যেত। এভাবে ধীরে ধীরে পরবর্তী সময়ে তারা তিমি মাছে রুপান্তরিত হয়। (টীকা ৩২- Charles Darwin, *The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition*, Harvard University Press, 1964, p. 184.)

জন্মগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে মেন্ডেল এর আবিষ্কার ও বিংশ শতাব্দীতে জেনেটিক বিজ্ঞানের সমর্থন এই কাল্পনিক কাহিনীকে পুরোপুরি বাতিল করে দেয় যে , প্রাণীর অর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলি পরবর্তীতেও সব বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হতেই থাকবে। এভাবে , প্রাকৃতিক নির্বাচন পদ্ধতি বিবর্তনবাদের কৌশল হিসাবে আর জনপ্রিয় থাকলো না।

নব্য-ডারউইনবাদ ও মিউটেশন (রুপান্তর/পরিবর্তন):

১৯৩০ সালের শেষে ডারউইন সমাধান পেতে (Modern Synthetic Theory) বা " আধুনিক সমন্বিত তত্ত্বের" কথা বলেন ; যা নব্য-ডারউইনবাদ হিসাবে বহুল প্রচলিত। এরা প্রাণীর রুপান্তর বা পরিবর্তনের কথা বলেন। মিউটেশন হলো প্রাণীর জীনের ভিন্ন রুপান্তর । বাহ্যিক বিভিন্ন কারণ যেমন তাপ বিকীরণ , প্রকৃতিতে কোন পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে প্রাণীর জীনের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে। " অনুকূল পরিবর্তনের কারণ '' হিসাবে এই মিউটেশন ঘটে। বর্তমানে পৃথিবীতে বিবর্তনবাদের মডেল হলো

নব্য-ডারউইনবাদ। এই মত দাবী করে আমরা এখন যে সব প্রাণী দেখি , তা রূপান্তরিত প্রাণী অর্থাৎ মিউটেশনের ফল । জীবন্ত প্রাণীর জটিল শারীরিক কাঠামোগুলি যেমন কান , চোখ , লাংস , ডানা ইত্যাদিতে বহু দিন ধরে ' রূপান্তর ' ঘটেছে ; যা এক ধরনের জেনেটিক বিশৃঙ্খলা । বর্তমানে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি এই মতকে সম্পূর্ণ বর্জন করে। মিউটেশন প্রাণীকে উন্নততর পর্যায় নিয়ে যায় না। বরং মিউটেশন প্রাণীকূলের জন্য ক্ষতিকর । এর কারণ খুবই সহজ। ডি এন এর কাঠামো খুবই জটিল ; এই কাঠামোতে এলোমেলো অদল-বদল ক্ষতিরই কারণ হবে। মার্কিন জীনতত্ত্ববিদ B.G. Ranganathan ব্যাখ্যা করে বলেন , মিউটেশন হলো ছোট , আকস্মিক এবং ক্ষতিকর। এটা খুব কমই ঘটে থাকে এবং এটারই সম্ভাবনা বেশী যে , এর তেমন স্থায়ী প্রতিক্রিয়া হবে না। মিউটেশনের চারটি বৈশিষ্ট্যই এই দিক-নির্দেশই দেয় যে , মিউটেশনের মাধ্যমে বিবর্তনে কোন উন্নয়ন ঘটতে পারে না।

বিশেষভাবে গঠিত উচ্চ ক্ষমতার জৈব-কাঠামোতে উল্টাপাল্টা অদল-বদল হলে তা হয় প্রতিক্রিয়াহীন হবে অথবা হবে ক্ষতিকর। ঘড়ির কাঠামোতে এলামেলো বদল ঘটালে তাতে ঘড়ির কোন উন্নতি হবে না। সম্ভাবনা বেশী যে এটা ক্ষতি করবে অথবা বড়জোর কোন প্রভাব ফেলবে না। ভূমিকম্প হলে একটা শহরের কোন উন্নতি হয় না , বরং তা ধ্বংস ডেকে আনে। (টীকা ৩৩-B. G. Ranganathan, *Origins ?*, Pennsylvania: The Banner Of Truth Trust, 1988.

অবাক হওয়ার কিছু নেই যে , এমন কোন প্রমাণ এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় নি যে মিউটেশনের ফলে কোন প্রাণীর জেনেটিক কোডের উন্নতি ঘটেছে । সব মিউটেশনই ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। এটা বুঝতে পারা গিয়েছে , যাকে ' বিবর্তনবাদের কলা-কৌশল ' হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে , তা আসলে জেনেটিক কোডে সাধিত হয় এবং প্রাণীর ক্ষতি করে ও তাকে পঙ্গু করে ফেলে (মানুষের উপর মিউটেশনের সাধারণ প্রভাব হলো ক্যান্সার)।

নি:সন্দেহে , কোন ক্ষতিকর পদ্ধতিকে '' বিবর্তনের কৌশল '' বলা যাবে না। অন্যদিকে প্রাকৃতিক নির্বাচন যে '' নিজে থেকে কিছুই করতে পারে না ''---এটা ডারউইন নিজেও স্বীকার করেছেন। এসব তথ্য আমাদেরকে এটাই দেখায় যে , প্রকৃতিতে কোন বিবর্তনবাদের পদ্ধতি নেই । যেহেতু কোন বিবর্তনবাদী কৌশলের অস্তিত্ব নেই , তাই ক্রমবিকাশের কোন কাল্পনিক প্রক্রিয়াও আসলে ঘটে নি।

ফসিল / জীবাশ্মের ইতিহাস: মধ্যবর্তী আকৃতির কোন চিহ্ন নেই :

জীবাশ্মের ইতিহাস সবচেয়ে সুস্পষ্ট বাস্তবতা যে , বিবর্তনবাদ আসলে সংঘটিত হয় নি। বিবর্তনবাদের মত অনুযায়ী , সব জীবন্ত প্রাণীই তার পূর্ব-পুরুষ থেকে এসেছে। অতীতের প্রজাতিরা সময়ের সাথে সাথে ভিন্ন প্রজাতিতে রুপান্তরিত হয়। সব প্রজাতিই এভাবে এসেছে। এই মত অনুযায়ী , লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই রুপান্তর প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে।

যদি তাই হতো , তাহলে অসংখ্য মধ্যবর্তী প্রজাতির অস্তিত্ব অবশ্যই থাকতো এবং এই দীর্ঘ রুপান্তরের সময়ে অবশ্যই অসংখ্য প্রজাতি বেঁচে থাকতো। যেমন , অর্ধেক মাছ / অর্ধেক সরীসৃপের অতীতে বেঁচে থাকার কথা , যারা মাছের বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি সরীসৃপের বৈশিষ্ট্যও অর্জন করেছিল ; অথবা সরীসৃপ-পাখীর অস্তিত্ব থাকতো যারা সরীসৃপের পাশাপাশি পাখির বৈশিষ্ট্যও অর্জন করেছিল। এই পরিবর্তিত অবস্থা চলার সময় তাদের ত্রুটিপূর্ণ ও পঙ্গু প্রাণীতে পরিণত হওয়ার কথা।

বিবর্তনবাদীরা এসব কাল্পনিক প্রাণীর অস্তিত্ব অতীতে ছিল বলে বিশ্বাস করে ও এদেরকে নাম দিয়েছে '' পরিবর্তনকালীন প্রতিমূর্তি '' ("transitional forms."
এসব প্রাণী যদি সত্যিই থাকতো , তাহলে অবশ্যই লক্ষ , লক্ষ এমন কী কোটি , কোটি সংখ্যার নানা বৈচিত্রের প্রাণী থাকতো । সবচেয়ে বড় কথা , ফসিলের ইতিহাসের এসব আজব প্রাণীর ধ্বংসাবশেষ অবশ্যই থাকতো। ডারউইন *The Origin of Species* ব্যাখ্যা করে বলেন : যদি আমার তত্ত্ব সঠিক হয়, তবে অসংখ্য মধ্যবতী প্রজাতি যারা যে প্রজাতি থেকে এসেছে তাদের অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল------পরিণামে তাদের পূর্ববর্তী অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যাবে কেবলমাত্র ফসিলের মধ্যে। (টীকা ৩৪ -. Charles Darwin, *The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition*, Harvard University Press, 1964, p. 179)

ডারউইনের আশা চূর্ণ:

ফসিলের সন্ধানে যদিও ১৯ শতাব্দীর মধ্যভাগে পুরো পৃথিবী জুড়ে বিবর্তনবাদীরা কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় , মধ্যবতী প্রজাতির কোন অস্তিত্ব তারা আবিষ্কার করতে পারে নি। সব ফসিল বিবর্তনবাদীদের প্রত্যাশার বিপরীত প্রমাণ পেশ করে যে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব হঠাৎ করে হয়েছে এবং তা হয়েছে পূর্ণ আকৃতিতেই। বিখ্যাত

ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ডেরেক ভি এযার এই মত স্বীকার করে নেন --যদিও তিনি ছিলেন একজন বিবর্তনবাদী।

আমরা যদি জীবাশ্মের ইতিহাস পরীক্ষা করি , তা সে সময়ের ক্রম হিসাবেই হোক বা বিশেষ প্রজাতিকে নিয়েই হোক্ , তা বারেবারে এটাই নির্দেশ করে যে , সব জীবন্ত প্রাণী ধাপে ধাপে বিবর্তনের মাধ্যমে নয় বরং হঠাৎ করেই এসেছে। (টীকা ৩৫: . Derek A. Ager, *"The Nature of the Fossil Record"*, Proceedings of the British Geological Association, vol 87, 1976, p. 133)

অর্থাৎ জীবাশ্মের ইতিহাসে সব জীবন্ত প্রাণীর আকস্মিক আবির্ভাব হলো পূর্ণ অবয়বে ---মধ্যবর্তী কোন আকৃতি ছাড়াই। এ হলো , ডারউইনের অনুমানের সম্পূর্ণ বিপরীত। এছাড়াও , এটা খুবই শক্তিশালী প্রমাণ যে ,জীবন্ত প্রাণীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কোন পূর্ব-পুরুষ থেকে বিবর্তন ছাড়াই জীবন্ত প্রাণীর পূর্ণ অবয়বে অপ্রত্যাশিত সৃষ্টির একটাই ব্যাখ্যা হলো , এসব প্রজাতিকে এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে। বিখ্যাত বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী ডগলাম ফুতুয়িমাও এই সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

সৃষ্টি ও বিবর্তনবাদ --এই দুইয়ের মাঝে রয়েছে প্রাণের বিকাশের সম্ভাব্যতা নিয়ে পৃঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা। জৈবিক কাঠামো পৃথিবীতে পূর্ণ অবয়বে এসেছে অথবা আসে নি। যদি না এসে থাকে , তাহলে অবশ্যই আগের কোন প্রজাতির থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় উন্নয়নের মাধ্যমে তারা বিকশিত হয়েছে । আর যদি পূর্ণ আকৃতিতে তারা এসে থাকে , তবে তারা অবশ্যই সৃষ্ট হয়েছে কোন সর্বশক্তিমান , সর্বজ্ঞানীর দ্বারা। (টীকা ৩৬-. Douglas J. Futuyma, *Science on Trial*, New York: Pantheon Books, 1983. p. 197)

জীবাশ্ম নির্দেশ করে , পৃথিবীতে প্রাণী এসেছে পূর্ণ আকৃতিতে এবং নিখুঁত অবস্থায়। অর্থাৎ প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে ডারউইনের ধারণার বিপরীতে সৃষ্টির মাধ্যমে , বিবর্তনের মাধ্যমে নয়।

মানব বিবর্তনের কাহিনী:

বিবর্তনের প্রচারকারীরা প্রায়ই একটি বিষয় আলোচনায় আনেন , তাহলো মানুষের উৎপত্তি। ডারউইনবাদীরা দাবী করে , বর্তমানের মানুষ এসেছে এক ধরনের বানর জাতীয় প্রাণী থেকে। তাদের মতে , ৪-৫ মিলিয়ন বৎসর আগে বিবর্তনবাদের প্রক্রিয়ায় এখনকার মানুষ ও তার পূর্ব-পুরুষদের মধ্যবর্তী
‘‘ রুপান্তরিত প্রজাতির’’ অস্তিত্ব ছিল। এই কাল্পনিক চিত্রে চারটি প্রধান শ্রেণী রয়েছে।

১। অষ্ট্রেলোপিথিকোস Australopithecus

২। হোমো হেবেলিস Homo habilis

৩। হোমো ইরেক্টাস Homo erectus

৪। হোমো সেপিয়েনস Homo sapiens

মানুষের প্রথম তথাকথিত বানর-জাতীয় পূর্বপুরুষদেরকে বিবর্তনবাদীরা নাম দিয়েছে ‘অষ্ট্রেলোপিথিকোস ’ যার অর্থ দক্ষিণ আফ্রিকার বানর বা বন-মানুষ। এই জীবন্ত প্রাণীরা আসলে কিছুই নয় বরং প্রাচীন বানরের প্রজাতি যারা পরে ধ্বংস হয়ে যায়। এই প্রজাতির উপর ব্যাপক গবেষণা করেন বিশ্বের দুই বিখ্যাত এনাটমিস্ট (শরীরতত্ত্ববিদ) ইংল্যান্ড ও আমেরিকার লর্ড সলি যুকারমেন ও অধ্যাপক চার্লস অক্সফোর্ড। এরা দেখান যে , এই প্রজাতি সাধারণ বানরের প্রজাতির এবং পরে ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষের সাথে কোনভাবেই এদের কোন মিল নেই। (টীকা ৩৭-. Solly Zuckerman, *Beyond The Ivory Tower,* New York: Toplinger Publications, 1970, pp. 75-94; Charles E. Oxnard, *"The Place of Australopithecines in Human Evolution: Grounds for Doubt"*, Nature, Vol 258, p. 389)

বিবর্তনবাদীরা শ্রেণীভাগ অনুযায়ী মানব বিবর্তনের পরবর্তী ধাপ হলো হোমো -- যা হলো মানুষ। বিবর্তনবাদীদের দাবী অনুসারে ‘অষ্ট্রেলোপিথিকোসদের তুলনায় হোমো প্রজাতির প্রাণীরা বেশী উন্নত।

প্রাণীর বিভিন্ন জীবাশ্ম এক নির্দিষ্ট ধারায় সাজিয়ে বিবর্তনবাদীরা খেয়াল খুশী মতো বিবর্তনের এক কাল্পনিক নক্শা আবিষ্কার করেছেন। এই নক্শা কাল্পনিক কেননা ,

এটা কখনোই প্রমাণিত হয় নি যে , এই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কোন ক্রমবিকাশের সম্পর্ক ছিল। আর্ণেষ্ট মেয়র , বিংশ শতাব্দীতে বিবর্তনবাদের অন্যতম প্রধান সমর্থক এটা স্বীকার করেন। তিনি বলেন : হোমো সেপিয়েনস পর্যন্ত আসতে আসতে সংযোগ সূত্র আসলে হারিয়ে যায়। (টীকা ৩৮-J. Rennie, *"Darwin's Current Bulldog: Ernst Mayr"*, *Scientific American*, December 1992)

সংযোগ সূত্রকে Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo sapiens-- এভাবে চিত্রিত করে বিবর্তনবাদীরা বলতে চায় , এসব প্রজাতি একে অন্যের পূর্বপুরুষ ; যদিও সাম্প্রতিক সময়ের নৃতাত্ত্বিক জীবাশ্মের আবিষ্কার প্রমাণ করে যে অষ্ট্রেলোপিথিকোস,
হামো হেবেলিস ও হোমো ইরেক্টাস আসলে একই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বাস করতো। (টীকা ৩৯-. Alan Walker, Science, vol. 207, 1980, p. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1st ed., New York: J. B. Lipincott Co., 1970, p. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, vol. 3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, p. 272)

এছাড়াও , যাদেরকে হোমো ইরেক্টাস বলা হচ্ছে , তাদের এক অংশ এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত বেঁচে ছিল। হোমো সেপিয়েন্স নিনডারথালেনসিস ও হোমো সেপিয়েন্স সেপিয়েন (আধুনিক মানুষ) একই সময়ে একই অঞ্চলে বাস করেছে।
(টীকা ৪০- Time, November 1996)

এই পরিস্থিতি এ দাবীকে মিথ্যা প্রমাণ করে যে , এরা একে অন্যের পূর্বপুরুষ। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবাশ্ম বিজ্ঞানী স্টিফেন জে গোল্ড বিবর্তন তত্ত্বের এই কোণ-ঠাসা অবস্থার ব্যাখ্যা করেন -- যদিও তিনি নিজেও একজন বিবর্তনবাদী। " আমাদের উত্তরণের কী হবে যদি তিনটি জাতি *(A. africanus, the robust australopithecines, and H. habilis), একই সাথে বাস করে এবং স্পষ্টত:ই একে অন্যের থেকে আসে নি ? সবচেয়ে বড় কথা , এই পৃথিবীতে বাস করার সময় কেউই বিবর্তনের কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে নি। (টীকা ৪১-*. S. J. Gould, *Natural History*, vol. 85, 1976, p. 30)

" অর্ধেক বানর , অর্ধেক মানুষ '' --এসব বিভিন্ন আঁকা ছবির সাহায্যে মানব বিবর্তনের যে চিত্র গণমাধ্যম ও পাঠ্য বইতে তুলে ধরা হয়েছিল , স্পষ্ট ভাষায় বললে তা এক

প্রতারণা। এটা আর কিছুই নয় বরং এক উপকথা যার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। লর্ড সলি যুকারম্যান , ব্রিটেনের অন্যতম বিখ্যাত ও শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী ; এই বিষয়ে তিনি বহু বছর গবেষণা করেন। বিশেষত: Australopithecus জীবাশ্মের উপর ১৫ বছর পড়াশোনা করেন। তিনি নিজে বিবর্তনবাদী হয়েও শেষ পর্যন্ত এটা স্বীকার করেন যে , বানর জাতীয় প্রাণী থেকে মানুষ পর্যন্ত কোন বংশ-তালিকা আসলে নেই।

যুকারম্যান বিজ্ঞানের একটি বর্ণালী শ্রেণীবিন্যাস করেন। যে সব বিষয়কে তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক ও অবৈজ্ঞানিক মনে করেন , তার একটি তালিকা তিনি করেন। তার মতে , বিজ্ঞানের সুদৃঢ় তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে সবচেয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক ক্ষেত্রে হলো রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা। এরপর আসে জীববিজ্ঞান , তারপর সামাজিক বিজ্ঞান । তালিকার শেষের দিকে রয়েছে সবচেয়ে বড় অবৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি। এর মধ্যে আছে অতীন্দ্রিয় অনুভূতিগুলি যেমন টেলিপ্যাথী এবং ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। সবচেয়ে অবৈজ্ঞানিকের তালিকার সব শেষে এসেছে মানব বিবর্তন। যুকারম্যান এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন , " তালিকাভুক্তি করার সময় বস্তুনিষ্ঠ সত্যের ক্ষেত্র থেকে অনুমিত জীববিজ্ঞানকে আলাদা করেছি ; যেমন: অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা বা মানুষের জীবাশ্মের ইতিহাসের ব্যাখ্যা। যারা সৎ বিবর্তনবাদী তারা সব সম্ভাবনাকে সত্য বলে যাচাই করবে ; কিন্তু যারা বিবর্তনবাদে অতি উৎসাহী তারা কখনো কখনো বিরোধপূর্ণ বিষয়কেও একই সাথে বিশ্বাস করে (টীকা ৪২- Solly Zuckerman, *Beyond The Ivory Tower*, New York: Toplinger Publications, 1970, p. 19)

মানব বিবর্তনের কাহিনী আর কিছুই নয় বরং জীবাশ্মের ব্যপারে কিছু মানুষের পূর্ব-ধারণা প্রসূত ব্যাখ্যা যা তারা অন্ধবিশ্বাসে আঁকড়ে আছে।

চোখ ও কানের প্রযুক্তি:

বিবর্তন তত্ত্বে আরেকটি বিষয় অমীমাংসিত ,তাহলো চোখ ও কানের দারুণ উপলব্ধির ক্ষমতা। চোখ নিয়ে আলোচনার আগে সংক্ষেপে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া যাক্---- আমরা কিভাবে দেখি ? কোন বস্তু থেকে আলোর রশ্মি উল্টো প্রতিবিম্ব চোখের রেটিনাতে এসে পড়ে। এই রশ্মি সেলের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক সংকেত পাঠায় এবং ব্রেনের পিছনে ছোট্ট এক বিন্দু যাকে দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু বলা হয় , সেখানে পৌঁছে। এই বৈদ্যুতিক সংকেত ব্রেনের কেন্দ্রবিন্দুতে বেশ কিছু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সোজা প্রতিবিম্ব হিসাবে উপস্থাপিত হয়। এমন কারিগরী কলা-কৌশলকে পটভূমিতে রেখে চলুন আমরা কিছু চিন্তা করি।

আলো থেকে আমাদের ব্রেন সম্পূর্ণ আলাদা অর্থাৎ ব্রেনের ভিতরে সম্পূর্ণ অন্ধকার । ব্রেনের যেখানে অবস্থান সেখানে আলো পৌঁছাতে পারে না । যাকে বলা হয় 'দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু ' সেই জায়গাটি পুরোপুরি একটি অন্ধকারময় স্থান যেখানে কখনোই কোন আলো যেতে পারেনি। আপনার চেনা-জানার জগতে সম্ভবত এটাই সবচেয়ে অন্ধকারময় জায়গা। যদিও আপনি এই সম্পূর্ণ অন্ধকার জগত থেকেই আলোকময় পৃথিবীকে দেখতে পান। চোখের ভিতরে যে ছবি তৈরী হয় , তা এতো তীক্ষ্ণ ও অভ্রান্ত যে , এমন কী এই বিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিও তা অর্জনে ব্যর্থ। যেমন , যে বইটি আপনি পড়ছেন তার দিকে তাকান , আপনার হাতের দিকে তাকান ; তারপর মাথা তুলে চারপাশে দেখুন । কখনো কি এমন ,তীক্ষ্ণ , স্পষ্ট , নির্ভুল প্রতিবিম্ব কোথাও দেখেছেন ? বিশ্বের সবচেয়ে বড় টিভি নির্মাতাও তার সবচেয়ে আধুনিক টিভি পর্দায় এরকম তীক্ষ্ণ প্রতিবিম্ব আপনাকে দেখাতে পারবে না। চোখ দিয়ে যা দেখি , তা হচ্ছে ত্রিমাত্রিক , রঙীন এবং অত্যাধিক তীক্ষ্ণ প্রতিবিম্ব। ১০০ বছরের বেশী সময় ধরে হাজার হাজার প্রকৌশলী এই তীক্ষ্ণতা অর্জনের জন্য চেষ্টা করছেন। কারখানা , বিশাল ভবন তৈরী হয়েছে ; প্রচুর গবেষণা হয়েছে , নক্শা ও পরিকল্পনা করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে। আবারো টিভি পর্দার দিকে তাকান আর আপনার হাতে ধরা বইয়ের দিকে তাকান। আপনি দেখবেন এই দুইয়ের তীক্ষ্ণতা ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে । এছাড়া , টিভি আপনাকে দেখাচ্ছে দ্বি-মাত্রিক চিত্র যেখানে আপনি চোখের সাহায্যে ত্রি-মাত্রিক প্রতিচ্ছবি গভীরভাবে অনুভব করতে পারছেন।

বহু বছর ধরে হাজারো প্রকৌশলী চেষ্টা করছে ত্রি-মাত্রিক টিভি বানাতে ও চোখের দৃষ্টির সমমানে আসতে । হ্যাঁ , তারা ত্রি-মাত্রিক টিভির এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে কিন্তু বিশেষ চশমা না পরলে সে টিভি দেখা যায় না। এছাড়াও , এটা কেবলমাত্র একটি কৃত্রিম ত্রি-মাত্রিক ব্যবস্থা। এর পটভুমি থাকে ঝাপসা , সামনের দিক মনে হয় ঝুলানো কাগজের কাঠামো। চোখের মাধ্যমে যে তীক্ষ্ণ ও বিশেষমানের ছবি আমরা দেখি , সেই মানের প্রতিবিম্ব তৈরী করা আজো সম্ভব হয় নি। ক্যামেরা ও টিভি--এই দুই মাধ্যমেই প্রতিবিম্বের মানের ক্ষতি হয়।

বিবর্তনবাদীরা দাবী করে , যে কারিগরীর মাধ্যমে আমরা বিশেষ মানের তীক্ষ্ণ প্রতিচ্ছবি দেখি , তা ঘটনাচক্রে ঘটেছে। এখন যদি কেউ আপনাকে বলে , আপনার কামরার টিভি সেটটি হঠাৎ করেই তৈরী হয়ে গিয়েছে , তাহলে আপনি কী ভাববেন ? অনেক পরমাণু হঠাৎ করে একসাথে হয়ে এমন এক দৃষ্টি কৌশল আবিষ্কার করলো যার মাধ্যমে অত্যন্ত উন্নত মানের প্রতিচ্ছবি তৈরী হয় । পরমাণু কেমন করে এটা করে ফেললো যা হাজারো মানুষ করতে পারছে না ? যদি চোখের তুলনায় অনুন্নত প্রতিচ্ছবি দেখাচ্ছে

এমন একটি যন্ত্র আপনাআপনি সৃষ্ট না হয় , তাহলে তা এটাই প্রমাণ করে যে , চোখ ও চোখের সাহায্যে দেখা প্রতিচ্ছবি ঘটনাচক্রে তৈরী হওয়া সম্ভব নয়।

এই একই অবস্থা কানের জন্যও প্রযোজ্য। কানের বাইরের অংশ শব্দ পৌঁছে দেয় কানের মধ্যভাগে। কানের এই অংশ শব্দের প্রতিধ্বনি তীব্রতর করে পরিবাহিত করে। কানের ভিতরের অংশ এই প্রতিধ্বনিকে বৈদ্যুতিক সংকেত হিসাবে মস্তিস্কে পাঠায়। ঠিক দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুর মতোই ব্রেন বা মস্তিস্কের শ্রবণের কেন্দ্রবিন্দুতে এসে শব্দ শোনার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। চোখের পরিস্থিতি কানের জন্যও সত্য। তাহলো , ব্রেন আলোর মতো শব্দের থেকেও আলাদা অবস্থানে থাকে। মানুষের ব্রেন শব্দকে ভিতরে ঢুকতে দেয় না। তাই এতে কিছু যায় আসে না যে বাইরে কী প্রচন্ড আওয়াজ হচ্ছে। ব্রেনের ভিতরের অংশ থাকে সম্পূর্ণ নি:স্তব্ধ । তবুও ,তীক্ষ্ণতম শব্দটিকে ব্রেন উপলব্ধি করে। শব্দ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক আপনার এই ব্রেনের ভিতরেই আপনি শুনেন বাজনাদারদের যন্ত্রের ধ্বনি । এছাড়া , কোন ভীড়ের মধ্যেকার সব আওয়াজও আপনি শুনেন। যদি কোন যন্ত্রের সাহায্যে ঐ সময়ে আপনার ব্রেনের ভিতরে মাপা যায় , তাহলে দেখা যাবে ব্রেনের ভিতরের জায়গা পুরোপুরি শব্দহীন।

বহু দশক ধরে চেষ্টা চলেছে প্রকৃত শব্দের অনুরুপ প্রতিধ্বনি তৈরী ও পুনরায় উৎপাদন। এসব চেষ্টার ফল হলো শব্দ রেকর্ড করার যন্ত্র , উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পদ্ধতি এবং শব্দ অনুভব করার ব্যবস্থাদি। এসব প্রযুক্তি থাকার পরেও এবং হাজারো প্রকৌশলী ও বিশেষজ্ঞ এই ক্ষেত্রে কাজ করার পরেও এমন কোন শব্দ ধারণ করা যায় নি যা কানের শব্দ উপলব্ধি ক্ষমতার মত তীব্র ও স্পষ্ট। সংগীত শিল্পের সবচেয়ে বড় কোম্পানীর সর্বাধিক উন্নত মানের হাই-ফাই সিস্টেমের কথা চিন্তা করুন। এসব যন্ত্রে শব্দ ধারণ করা হলে তার অনেকটাই হারিয়ে যায় ; অথবা আপনি যখন হাই-ফাই যন্ত্রটি চালু করেন ,তখন সবসময়ই গান শুরুর আগে একটি হিসহিস ধ্বনি শুনতে পান। মানব দেহের কারিগরীতে যে শব্দ আপনি শুনেন , তা সাংঘাতিক তীব্র ও স্পষ্ট। মানুষের কান কখনো একটি শব্দের সাথে হিসহিস আওয়াজ শুনবে না যা মেশিনে শোনা যায়। শব্দ যেমন থাকে কান ঠিক তেমনটি শুনে ---তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট। মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই এমনটি হয়ে আসছে।

মানুষের চোখ ও কান সুক্ষ্ম অনুভূতিসহ যতটা সার্থকভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্য উপলব্ধি করে--- এখনো পর্যন্ত মানুষের তৈরী কোন অডিও-ভিডিও রেকর্ডিং যন্ত্র তেমনটি পারে নি। দৃষ্টি ও শ্রবণের ক্ষেত্রে একটি বড় সত্য লুকিয়ে আছে। দেখা ও শোনার ব্যাপারে ব্রেনের এই যে চেতনা , তা কার আজ্ঞাধীন ?

তিনি কে , যিনি ব্রেনের ভিতরে মনোহর এক পৃথিবীকে দেখাচ্ছেন ? সংগীতের সুর আর পাখির কিচির-মিচির শোনাচ্ছেন আর গোলাপের গন্ধ শোঁকাচ্ছেন ? মানুষের চোখ , কান ও নাক থেকে যে উদ্দীপনা আসে , তা ব্রেনে পৌঁছায় বৈদ্যুতিক - রাসায়নিক স্নায়বিক তাড়না হিসাবে।কিভাবে অবিকল প্রতিরূপ ব্রেনে গঠিত হয় ,সে সম্পর্কে জীববিজ্ঞান , শারীরবিদ্যা ও জৈব-রাসায়নিক বইতে আপনি বিস্তারিত তথ্য পাবেন। যদিও এই বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনি এসব বইতে পাবেন না। কে তিনি , যিনি এসব বৈদ্যুতিক-রাসায়নিক স্নায়বিক তাড়নাকে প্রতিচ্ছবি , শব্দ , গন্ধ ও অনুভূতি হিসাবে ব্রেনকে উপলব্ধি করাচ্ছেন ?

ব্রেন তার ভিতরে চোখ , কান , নাক থাকার কোন দরকার বোধ করছে না। এসব ছাড়াই সে তার চেতনা দিয়ে এসব উপলব্ধি করছে। এই যে জ্ঞান বা ক্ষমতা -- তার দাবীদার কে ? নি:সন্দেহে এ ক্ষমতা ব্রেন যা দিয়ে গঠিত সেই স্নায়ু , পুরু স্তর বা নিউরণের অধীন নয় । এই কারণে ডারউইনবাদী-বস্তুবাদীরা যারা বিশ্বাস করে জড় থেকে প্রাণ এসেছে , তারা এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। এই চেতনার জন্য আল্লাহ আত্মাকে সৃষ্টি করেছেন। দেখার জন্য আত্মার চোখের দরকার নেই , শোনার জন্য কানের দরকার নেই । এছাড়াও , চিন্তার জন্য তার ব্রেনেরও দরকার নেই। যারা এতক্ষণ এই বিশদ আলোচনা এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্পর্কে পড়লেন , তাদের উচিত আল্লাহকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা , তাঁকে ভয় করা এবং তাঁর কাছেই আশ্রয় চাওয়া। তিনিই আল্লাহ যিনি এক সম্পূর্ণ অন্ধকার , মাত্র কয়েক ঘন সেন্টিমিটারের মধ্যে পুরো মহাবিশ্বকে ঠেসে ভরে দিয়েছেন ত্রি-মাকি , রঙীন , ছায়াময় ও উজ্জ্বল আকৃতিতে।

বস্তুবাদী বিশ্বাস:

এ পর্যন্ত আমরা যে সব তথ্য উপস্থাপন করলাম , তা এটাই দেখায় যে , বিবর্তনবাদের তত্ত্ব হিসাবে যা দাবী করা হয়েছিল , তা বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির বিপরীত। প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কে এই তত্ত্বের দাবী বিজ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বিবর্তনবাদীদের যে কলা-কৌশলের কথা তারা বলে , তার আসলে বিবর্তন ঘটানোর কোন শক্তি নেই। জীবাশ্ম এটাই দেখায় যে , এই মতের দাবী অনুসারে যে মধ্যবর্তী প্রাণীর থাকার কথা ছিল , তার অস্তিত্ব আসলে কখনোই ছিল না । তাই , অবৈজ্ঞানিক হিসাবে বিবর্তনবাদের তত্ত্বকে অবশ্যই এক পাশে সরিয়ে ফেলতে হবে।অতীতে যেভাবে বিজ্ঞানের বিষয় থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে অনেক ধারণাকে ; যেমন: পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু ইত্যাদি। যাহোক , বিবর্তনবাদের মত এখনো বিজ্ঞানের একটি জরুরী বিষয় হিসাবে বিবেচ্য। কিছু মানুষ এই মতের সমালোচনাকে বিজ্ঞানের উপর আক্রমণ হিসাবে তুলে ধরেন ...কেন ?

এর কারণ হলো , কিছু মহলের কাছে এই বিবর্তনবাদ মত অপরিহার্য। এই চক্রের সদস্যরা বস্তুবাদী আদর্শের প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রকাশ করে এবং বিবর্তনবাদকে গ্রহণ করে ;

কেননা , বস্তুবাদের পক্ষে এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা যা তাদের কাজের ধারাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলে।

মজার ব্যপার হলো , তারা নিজেরাও এটা নানা সময়ে স্বীকার করেছে। সুপরিচিত জেনেটিকবিদ ও বিবর্তনবাদের স্পষ্ট বক্তা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রিচার্ড সি লিওয়ানটিন স্বীকার করেন , তিনি আগে একজন বস্তুবাদী , পরে বিজ্ঞানী। এমন নয় যে , এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্ব সম্পর্কে একটি বস্তুবাদী ব্যাখ্যা গ্রহণে বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক কোন প্রতিষ্ঠান আমাদেরকে বাধ্য করে। বরং বস্তু বা ভোগবাদীতার প্রতি অনুরাগই আমাদেরকে বাধ্য করে উদ্দেশ্যমূলক অনুসন্ধান চালাতে ও নির্দিষ্ট মত সৃষ্টি করতে , যা বস্তুবাদিতার সমর্থক। এতে কিছু যায় আসে না যে , আমাদের স্বত:স্ফূর্ত জ্ঞান বা সাধারণ অনুভূতি এর বিরুদ্ধে । এছাড়া , কতটা রহস্যজনকভাবে এই মতের সৃষ্টি হলো। রিচার্ড লিওটনের মন্তব্য হলো , বস্তুবাদিতা হলো স্বেচ্ছাচারিতা ---এর মধ্যে ঐশ্বরিক বিষয় আমরা আনতে পারি না। (টীকা ৪৩. Richard Lewontin, *"The Demon-Haunted World"*, The New York Review of Books, 9 January, 1997, p. 28)

এটা হলো স্পষ্ট বিবৃতি যে বিবর্তনবাদ হলো এমন এক মত , যাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে শুধুমাত্র ভোগবাদী মতবাদের প্রতি অনুরাগের কারণে। এই মত বর্ণনা করে যে , জড় পদার্থ ছাড়া আর কোনকিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। তাই এরা দাবী করে ---প্রাণহীন ,অচেতন পদার্থ থেকে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে। এরা জোর দিয়ে বলে যে লক্ষ , লক্ষ বিভিন্ন প্রকারের জীবন্ত প্রজাতি যেমন: পাখি , মাছ , জিরাফ ,বাঘ , কীট-পতঙ্গ , গাছ , ফুল , তিমি এবং মানুষের উৎপত্তি হয়েছে কিছু জড় পদার্থের মধ্যে আন্ত:ক্রিয়ার কারণে। যেমন , বৃষ্টি , বিদ্যুৎ ইত্যাদি। এই ধারণা যুক্তি ও বিজ্ঞান --দুটোরই বিরোধী। তবুও বিবর্তনবাদীরা এই মতকে সমর্থন করে যাচ্ছেন শুধুমাত্র যেন ‘‘কোন ঐশ্বরিক কিছু এর মধ্যে না আসতে পারে। ”

যারা ভোগের প্রেক্ষাপটে জীবনের উৎপত্তিকে দেখবে না ,তারাই স্পষ্ট সত্যকে দেখতে পারবে : সব জীবন্ত প্রাণীই হলো স্রষ্টার সৃষ্টি যিনি সর্ব-শক্তিমান ,সর্ব জ্ঞানী। তিনি সব দেখেন , সব শুনেন , সব জানেন । এই স্রষ্টাই হলেন আল্লাহ যিনি
অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে এই পুরো মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন ; একে সাজিয়েছেন সর্বোত্তম সুন্দর আকারে এবং সব জীবন্ত প্রাণীকে যিনি আকৃতি দিয়েছেন্

“ তারা (ফিরিশতারা) বললো : আপনি পবিত্র ; আপনি যা আমাদের শিখিয়েছেন , তাছাড়া আমাদের কোনই জ্ঞান নেই; নিশ্চয়ই আপনি প্রকৃত জ্ঞানী , বিজ্ঞানময় ’’ (পবিত্র কুরআন ; সুরা বাকারা ; ২: ৩২) ।